আশ্রয়

আশ্রয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শৈব্যা পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ ১৩৭১

মুদ্রক ঃ
ফিনিক্স প্রিন্টার্স
২, চোরবাগান লেন,
কলকাতা ৭০০০০৭

আমার বাবার লেখা যারা ভালবাসে

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

বাংলা ১৩১৩-র শারদ 'প্রসাদ'-এ 'আশ্রয়' উপন্যাস হিসাবে বের হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ আট বছরের বিরতি। শেষে এই নববর্ষে বই হিসেবে এর আচমকা আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের কৌতূহল জাগাবে। তাই পাঠক-দরবারে এই নিবেদন।

সেবার পুজোর আগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য শারদীয় পত্রিকার লেখাগুলি শেষ করে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাকি থেকে যায় শুধু 'প্রসাদ'-এর লেখা। কিন্তু 'প্রসাদ'-এর কাছে লেখক অনেক আগে থেকেই আত্মিক ও মৌখিক চুক্তিবদ্ধ। তখন কলম ধরার শক্তি ছিল না, তবু ভেতরের তাগিদে পুরো উপন্যাসটি মুখে মুখে আমাকে বলে যান। দিনের পর দিন তাঁর মুখের কথা কাগজে সাজিয়ে সাজিয়ে সেজে ওঠে 'আশ্রয়'। সেই সময় তাঁর ভেতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা ও ছটফটানি দেখেছি। সে অস্থিরতা স্রষ্টা সৃষ্টির তাড়নায় উন্মুখ কিন্তু প্রকাশের হাত অচল। সে ছটফটানি শাশ্বত শিল্পীর, যাঁর মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে আঁকা হয়ে চলেছে শিল্প সম্ভার কিন্তু তুলি ধরার আঙুলগুলি অচল। তবু কঠিন সব মোচড়ের মুহূর্তে, কি নিভৃতের অতনু সম্পর্কটি ফুটিয়ে তোলার সময়, কিংবা ঘন আবেগের মীড়ে ঝংকার তোলার ঠিক আগটিতে হঠাৎই আমার হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে অসুস্থ কাঁপা মুঠিতে শক্ত করে ধরতেন। ঝরঝর করে ঝরতে থাকত সৃষ্টির ফুল যা লেখকের নিজের হাতের লেখনী ছাড়া ফুটতে পারে না। এক একটি দুরূহ চড়াই-উতরাই অনায়াসে পার করে আবার যখন কলম ফিরিয়ে দিতেন তখন তিনি আরো অসুস্থ, কিন্তু তুষ্টিতে ভরপুর।

এ ভাবেই এই উপন্যাসের জন্ম। শারদীয় 'প্রসাদ'-এ 'আশ্রয়' বেরুল, কথা রাখলেন, কিন্তু বই হিসেবে বের করার

অনুমতি দিলেন না। তিনি বলেছিলেন, মুখ নয়—গল্প বলে লেখকের হাতে ধরা কলম·····আগাগোড়া নতুন করে নিজের হাতে লিখতে পারলে তবেই বই বের হবে।

কিন্তু সে সময় আর পাওয়া গেল না। মুঠো থেকে জল গড়িয়ে যাবার মত পিছলে গেল জীবন। এখন প্রশ্ন, 'আশ্রয়' কি তবে চিরকালের মত নিরাশ্রয় হয়ে থাকবে? পাঠকের চোখের আলোয় কি এর মূল্যায়ণ হবে না কোনদিনও? জন্মসূত্রে অর্জিত লেখকের যে রক্তধারা আমারও শিরায় শিরায় প্রবাহিত, তার বিপুল তাড়না আমাকে অস্থির করে চলল দিনের পর দিন—প্রতিদিন। অনেক টানা-পোড়েনের পর উপন্যাসটিকে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসার সিদ্ধান্তই স্থায়ী হল। আর এ সিদ্ধান্তে আমার সঙ্গে সামিল হলেন দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে। তাঁর জোগানো সাহস উৎসাহ ও উদ্দীপনার বর্ম পিঠে এঁটে, আমার ও 'আশ্রয়'-এর জনকের নিরুচ্চার আশীর্বাদের পুঁজি মাথায় নিয়ে আমার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী লেখকের ধারা অনুসরণ করে উপন্যাসটি আগাগোড়া সংস্কার করেছি। অন্তত চেষ্টা করেছি।

সফল হয়েছি কি না, সে বিচার পাঠকের। 'আশ্রয়'-এর একমাত্র আশ্রয় পাঠক-মন।

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

সাজগোজ শেষ করে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসেছিল নন্দিতা বোস! ভেতরটা সুস্থির ছিল না খুব। বারবার উসখুস করে ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রাখছিল। চব্বিশ বছরের জীবনে এই প্রথম সব থেকে বেশি সময় নিয়ে যত্ন করে সেজেছে নন্দিতা। খুব ভাল করেই জানে সুন্দরী কেন, সাদামাঠা বেশে সেরকম সুশ্রীও কেউ বলবে না তাকে। কিন্তু নিজের রূপ নিয়ে কোনো দিনই খেদ নেই নন্দিতার। সুখের ঘরের চেকনাই চেহারায় ভালমতই আছে। তার ওপর চলাফেরা কথাবার্তায় একটা সহজাত স্মার্টনেস্ আর ঝকমকে আকর্ষণের জন্যে বরাবরই বহু ছেলের চোখ সেরকম সুশ্রী মেয়েকে ছেড়েও ওর দিকে ঘুরতে দেখে অভ্যস্ত। এ নিয়ে মনে মনে মজাও পায় নন্দিতা।

এই যে একজন, মিহির দত্ত, যার জন্যে আজ এত সাজের ঘটা, সে নিজে তো দস্তুরমত স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। কিন্তু সেও শেষে মজল এসে এই সাধারণ মেয়ে নন্দিতায়! তবে হ্যাঁ, সহজ সাধারণ নন্দিতা চাইলে যে কোনো ছেলের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে বইকি। অবশ্য ওর প্রতি মিহির দত্তর আকর্ষণ কোনো হঠাৎ ঝোঁকের ফসল ভাবে না। নন্দিতা স্কুলে যখন ক্লাশ এইটে পড়ে তখন থেকে পিছনে লেগে থেকে ও ছেলে শেষ পর্যন্ত ওকে ঘায়েল করে তবে ছেড়েছে। নন্দিতাদের পুরনো বাড়ির, অর্থাৎ যেখানে এখন শুধু বাবা থাকে, তার ঠিক কোনাকুনি সামনের বড় বাড়িটা মিহিরদের। দাদু ব্যবসা করে মস্ত সম্পত্তি রেখে গেছে, বাবা বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। মিহির নিজেও নামী মিশনারি স্কুলের ভাল ছাত্র ছিল। তার ওপর স্পোর্টস-এ সব সময় এক নম্বর। চেহারাও দস্তুর মত ভাল। সব মিলিয়ে যাকে বলে একটা ঝকঝকে ছেলে। সব পাড়ার সব মেয়েগুলো ওকে নিয়ে হ্যাংলামিই করত! শুধু একজন বাদে। নন্দিতা নিজে। চেহারা ছাড়া অন্য সব বিচারে ও-ও মিহিরের

থেকে কোনো অংশে কম যায় না। ওদেরও ওই দত্ত বাড়ির মুখো-মুখি বেশ বড় বাড়ি। বাবা নামকরা ল-ইয়ার। আর ও নিজেও এক মস্ত মিশনারি স্কুলের নামী ছাত্রী। তার ওপর চমৎকার ডিবেট করে। কিন্তু সবচেয়ে চটকদার পরিচয় ও লেখিকা শমিতা বোসের মেয়ে। সেই সময় থেকেই এ দেশে শমিতা বোস দস্তুর মত নাম-ডাকের লেখিকা। ফলে নন্দিতা হেলাফেলার পাত্রী নয়, বা অন্যদের মত মিহিরের পিছনে ছোটার কোনো কারণ ওর যে অন্তত নেই, সেটা বোঝানোর একটা প্রচ্ছন্ন তাগিদ ভেতরে ভেতরে প্রায় সব সময়ই ছিল। সুযোগও একদিন হঠাৎ জুটে গেল।

জয়ার বাড়িতে টেবল-টেনিসের বোর্ড পাতা হয়েছিল। জয়া পাড়ার মেয়ে, তাছাড়া নন্দিতার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে নন্দিতা প্রায়ই জয়ার বাড়ি যেত। মিহিরও মধ্যে মধ্যে আসত। ওই বাড়ির সঙ্গে মিহিরদের কি একরকম দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। যেদিন মিহির আসত সেদিন অন্য মেয়েগুলোর জিভে ছিল যেন জল গড়ানোর দশা। কে ওর সঙ্গে খেলবে, কে ওর কাছে হেরে কৃতার্থ হবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আড়াআড়ি, কাড়াকাড়ি। নন্দিতা চুপচাপ লক্ষ্য করত। করুণা ছিটানোর মত করে ওই ছেলে কখনো এর সঙ্গে একটু কথা বলছে, কখনো ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসছে, কখনো বা কোনো একজনের সঙ্গে নিতান্ত হেলাফেলায় ব্যাটে-বলে তাল ঠুকছে, নন্দিতার পিত্তি জ্বলে যেত। কিন্তু কখনো কিছু বলত না। নির্লিপ্ত অবহেলায় মিহিরের অস্তিত্বকেই যেন পাশ কাটিয়ে যেত। এই চেষ্টাকৃত অবজ্ঞা ওই চৌকস ছেলের না বোঝার কোনো কারণ নেই। ফলে হাসিহাসি মুখে উল্টে সে-ই নন্দিতাকে সকৌতুকে লক্ষ্য করত। ভেতরে ভেতরে নন্দিতা যত জ্বলত বাইরে ততই ঠাণ্ডা। মুখে একটা আঁচড়ও পড়তে দিত না।

একদিন বিকেলে হৈ-হৈ করে খেলা চলছিল। ডাবল্‌স-এর খেলা। একদিকে নন্দিতা আর জয়া, অন্য দিকে পাড়ারই আর দুটি মেয়ে। এমন সময় হাসিহাসি মুখে মিহির এসে হাজির।

নন্দিতারা জিতছিল। হঠাৎ দেখা গেল ব্যাট হাতে টেবলের এ মাথায় শুধু ও একা দাঁড়িয়ে, আর বাকি সবকটা মেয়ে গিয়ে মিহিরকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে। এমন কি নন্দিতার পার্টনার জয়াও। কেউ মিহিরের হাতে ব্যাট গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে, কেউ হাত ধরে বোর্ড-এ নিয়ে আসার জন্যে টানাটানি করছে, আর মিহির ঠোঁটে নিরুপায় গোছের একটা হাসি ঝুলিয়ে সকলকে সমান মনোযোগ দেবার ভান করছে, আর মাঝেমাঝেই ঘাড় উঁচিয়ে নন্দিতার দিকে তাকাচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একবার শ্রাগও করল! যেন বলতে চায়, আমার কদর কত বুঝেছ? ঠিক তখনই নন্দিতার মাথায় আগুন জ্বলল। জেতা খেলাটা পণ্ড হতে নন্দিতা আগেই ক্ষেপেছে, ব্যাটটা টেবলের ওপর আছড়ে ফেলে পায়ে পায়ে মিহিরের এক হাত নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ঠোঁটে ধারালো হাসি, চোখে চোখ। বলল, ক'দিন আগে মায়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গাবের হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলাম। একটা নতুন শিম্পাঞ্জী আনা হয়েছে। সেটার একমাত্র গুণ দর্শকদের থেকে থেকে বেছে কেবল মেয়েদের বার করে নানা রকম ভঙ্গিতে তাদের এন্টারটেইন করা। মেয়েরা যত লাফায় ওটার লম্ফ-ঝম্পও ততো বাড়ে।

···তোমাকে দেখে হঠাৎ ওটার কথা মনে পড়ে গেল।

অন্য মেয়েগুলো হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু মিহির একগাল হেসে বলে বসল, আমিও ওটাকে চিনি। আসলে পছন্দ মাফিক একটি শিম্পাঞ্জিনীর অভাবেই অমন লাফঝাঁপ করে, পেলেই ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

···তোমাকে দেখে হঠাৎ আমার এটাই একমাত্র সলিউশন বলে মনে হল!

স্মার্ট মেয়ে নন্দিতা এরপর বোকার মতই রাগে ফুঁসে এক ঝটকায় চলে এসেছে। পিছনে আদেখলা মেয়েগুলোর আর ওই ডেঁপো ছেলের হাসির হুল্লোড় কান দুটোতে করকর করে বিঁধেছে। পরে রাগ কমতে নিজেও অবশ্য হাসিই পেয়েছে,

আর ও ছেলের কাছে ভালরকম জব্দ যে হয়েছেই সে কথা অস্বীকার করতে পারেনি। বোকার মত ওভাবে রাগ করে চলে না এসে উচিত ছিল ধরেধরে বেশ করে মেয়েগুলোর মাথা ঠুকে দেওয়া। ওদের জন্যেই তো এত বাড় ঐ ছেলের।

স্কুলের বাসেই যাতায়াত করত নন্দিতা। এরপর থেকে বাস আসার সময় হলেই ডেঁপো ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটা করে হাত নেড়ে টা-টা করত। নন্দিতা না দেখার ভান করত। তখন ওর ক্লাস এইটের শেষ আর মিহিরের সামনেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা। স্কুলের পাট সারা, বাড়িতে বসে ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কত যে তৈরি হচ্ছে নন্দিতা ভালই বুঝত। পরীক্ষা কেমন হবে ফল বেরুলেই দেখা যাবে। নিজেও তো ভাল ছাত্রী, রেজাল্ট ভাল করতে হলে কত কাঠখড় পোড়ানো দরকার তা বেশ জানা আছে। যখনই চোখ পড়ে, তখনই সামনের বারান্দায় চেয়ার-টেবল সাজিয়ে কতকগুলো বইখাতা নিয়ে মূর্তিমান এদিকেই চেয়ে বসে আছে।

একদিন নন্দিতা স্কুল-বাসে উঠতে যাওয়ার সময় যথারীতি মিহির বারান্দায়, আর ঠিক সামনে তার বাবা দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। বাসটা ওদের বাড়ির পাশে আসতেই নন্দিতা সদর্পে ফিরে তাকাল, ভাবখানা, আজ টা-টা'র কি হল? কিন্তু ও ছেলে কত বড় বজ্জাত যদি জানত! চোখের পলকে টেবল থেকে লম্বা খাতাটা খুলে বাবাকে আড়াল করে ঘটা করে হাত নাড়তে লাগল। নন্দিতা রাগের চোটে চার আঙুল জিভ বার করে ভেংচি কেটেই অপ্রস্তুত। মেয়েরা অনেকেই, আর বাসে যে দুজন মিস্ থাকে তারাও ব্যাপারটা দেখেছে। দুজনেই ভয়ানক গম্ভীর, মেয়েরা কেউ কেউ রুমাল আড়াল করে হাসছে। জিনিসটা ঘোরালো হল টিফিনের সময়। প্রিন্সিপাল নন্দিতা বোসকে তাঁর ঘরে তলব করলেন। ভাল ডিবেটার আর নামী ছাত্রী নন্দিতা এত বছরের

স্কুল জীবনে এই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। প্রিন্সিপালের মুখ থমথমে। —তুমি আজ বাসে কি করেছ?

নন্দিতা তক্ষুণি মাথা নেড়েছে, কিছু করিনি।

তাহলে দুজন মিস-ই বাজে কথা বললেন?

নন্দিতা চুপ।

তুমি ভাল ছাত্রী, ভাল ফ্যামিলির মেয়ে, পড়ছ ভাল স্কুলে, তোমার কাছ থেকে এ ধরনের বিহেভিয়ার আশা করিনি। ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম হলে বাড়িতে চিঠি যাবে, যাও।

অপমানে কাঁপতে কাঁপতে নন্দিতা ক্লাশে এসেছে। সেদিন আর এক বর্ণও পড়া মাথায় ঢোকেনি। স্কুল ছুটি হতে নিঃশব্দে বাসে উঠেছে। কারুর দিকে তাকায়নি। বাস বাড়ির সামনে আসতে নেমেছে, তারপর গটগট করে রাস্তা পেরিয়ে বাসের মেয়েদের আর দোতলায় দাঁড়ান মায়ের হতভম্ব চোখের ওপর দিয়ে সোজা দত্ত বাড়িতে ঢুকেছে। মিহির দত্ত তখন বারান্দায় ছিল, এসময় রোজই থাকত। সে-বেশ হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই নন্দিতা ওদের দোতলার বারান্দায়। সামনের টেবলে অন্য বইপত্তরের সঙ্গে সকালের সেই লম্বা খাতাটাও ছিল! আচমকা সেটা তুলে অবাক ছেলেটার মাথায় ঠাস করে একটা বাড়ি মেরে বসল নন্দিতা, তারপর খাতাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তেমনি গটগট করে নেমে গেল। বাড়ি ঢুকতেই মা ওর ওপর চড়াও, এটা কি করে এলি?

নন্দিতা দ্বিগুণ ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, বেশ করেছি, ওই বজ্জাত ছেলের জন্যে স্কুলে আজ কিরকম নাকাল হয়েছি জান?

মা অবাক। কি হয়েছে বলবি তো?

রাতে খাওয়ার সময় বলব'খন। তখন বাবাও থাকবে···মেয়ের মেজাজ দেখে শমিতা বোস আর এ নিয়ে কথা বাড়ায়নি। এরপর নন্দিতা ওই বারান্দার দিকে ফিরেও তাকাত না। কিন্তু কেউ একজন যে ওখানে বসে ওর যাওয়া-আসা আগের থেকেও বেশি লক্ষ্য করে তা ঠিক টের পেত।

কিছুদিন পরে জয়া একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। হ্যাঁরে, তুই নাকি মেরে মিহিরের মাথার ঘিলু নাড়িয়ে দিয়েছিস? সত্যি?

নন্দিতার হাসার কথা, কিন্তু রাগই হয়ে গেল। বলল, খবরটা কাগজে বেরিয়েছে?

বেরুনোর মতই তো, তুই সত্যি দোতলায় উঠে গিয়ে ওকে মেরেছিস?

ও তাই বলল?

বলল মানে? মার খেয়ে অমন খুশি মুখ জীবনে দেখিনি। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি বয়ে এসে আমাকে জিগেস করল। সেদিন ওর টা-টা করা আর জিভ ভ্যাংচানো নিয়ে স্কুলে কিছু হয়েছিল কি না।

নন্দিতা খেঁকিয়ে উঠল, আর তুই ওমনি হ্যা-হ্যা করে সব বললি?

বলব না তো কি? কিন্তু শেষে তোকে যা এক হাত নিল না, শুনে আমরা হেসে মরি। থাক বাবা, তুই আরও রেগে যাবি।

না তো কি তোদের মত অনুরাগে ঢলে পড়ব? বলার জন্যে তোর পেট তো ফুলছে, দয়া করে গুণমণির গুণের কথা শুনিয়ে বিদেয় হ'। তোদের মত আদেখলেও আর দেখিনি বাপু।

জয়ার কাঁচুমাচু মুখ, আমরা তো এলেবেলের দল, তুই হলি গিয়ে আসল নায়িকা। শোন তাহলে, মিহির বলেছে, নন্দিতা বসু তো খুব ভাল ছাত্রী, তাই হৃদয়ে না মেরে সরাসরি মগজে মেরেছে, এর ফলে ওর মাথা এখন দারুণ সাফ, কিন্তু বুকে বড়ই ব্যথা। তোর মার নাকি ওর মস্তিষ্ক ছেড়ে হার্টের একেবারে মধ্যিখানে ঘা বসিয়েছে, চিকিৎসাও তোকে দিয়েই করিয়ে ছাড়বে।

এর পরেও নন্দিতা মুখে রাগই দেখিয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এবার যে-রকম সাড়া জেগেছে তা মাত্র এই বয়সের এক মেয়ের কাছে বিচিত্র তো বটেই।

পরের ঘটনা আরও নাটকীয়। নন্দিতা আর মিহিরদের স্কুল একই চার্চের অধীনে। দুটোই নামকরা কেতাদুরস্ত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল। এদের কোনো ফাংশনে ওদের বা ওদের কোনো অনুষ্ঠানে এদের ছাত্রছাত্রীদের নেমন্তন্ন থাকেই। সেবারের সিনিয়ার-কেম্ব্রিজ পরীক্ষার ঠিক পরেই নন্দিতাদের স্কুল তাদের বিদায়ী ছাত্রীদের নিয়ে একটা স্যোশাল গেট-টুগেদারের আয়োজন করল। আর তাতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হল ঐ চার্চের আণ্ডারের আর বাকি তিনটি স্কুলের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিহিরদেরও নেমন্তন্ন হয়েছে। নন্দিতাদের কাজ সেদিন অতিথি ছাত্রছাত্রীদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করা।

সন্ধের সময় ফুল-কাগজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো মস্ত হলে অতিথিরা সব জড় হয়েছে। মিহিরদের স্কুলেরও সকলেই এসেছে। স্পোর্টস্-এ মিহির দত্ত বরাবরের একচেটিয়া চ্যাম্পিয়ান, ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস কম্পিটিশানেও ক'দিন আগে পর্যন্ত নিজের স্কুলকে বহু কাপ-শিল্ড এনে দিয়েছে। তাই তাদের স্কুলের সে মধ্যমণি। তার হাবভাবেও হিরোসুলভ ভাব স্পষ্ট। দেখাচ্ছেও সেই রকমই। এই বয়সেই প্রায় ছ'ফুট ছুঁই ছুঁই সটান চেহারা। পেটানো ছিপছিপে শরীর। পাকা গমের মত গায়ের রং। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল আর চকচকে দুটো কালচে বাদামী দুষ্টুদুষ্টু চোখ। পরনে সেদিন ঘন ছাইরঙা সাফারি সুট। সব মেয়ে ছেড়ে নন্দিতাও যে চুরি করে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল, সে কথা নিজের কাছে আর অস্বীকার করে কি করে! নাটকীয় ঘটনাটা ঘটল নাচের বাজনা শুরু হবার পর। সাহেবী কায়দার স্কুল, এ ধরনের স্যোশাল সাধারণত মিউজিক আর নাচ দিয়েই শুরু হয়। অর্থাৎ মেয়েরা যার যার পার্টনার বেছে নিয়ে নাচের ফ্লোরে যাবে। নন্দিতার স্কুল এই ফাংশানের অরগানাইজার। সুতরাং ওদের স্কুলের বিদায়ী ব্যাচের মেয়েদেরই প্রথম চান্স পার্টনার বাছাইয়ের। বলা বাহুল্য প্রথম মেয়েটিই মিহিরকে পছন্দ করল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দেখা গেল মিহির হাতজোড় করে মাথা নেড়ে নিজের

অক্ষমতা জানাল। সাধারণত এ ধরনের অনুষ্ঠানে এরকম ব্যাপার বড় একটা হয় না। হঠাৎ কারুর শরীর খারাপ হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু মিহির দত্তকে দেখে কেউ বলবে না তার শরীর এতটুকু অসুস্থ। ফলে সেই মেয়ে যেমন অপ্রস্তুত তেমনি অবাক। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মেয়েটির বেলায়ও একই ব্যাপার। মিহির সবিনয়ে তাদের কাছেও মাফ চেয়ে নিল। এর পরের মেয়েরা কিছু একটা হয়েছে বুঝে ওকে এড়িয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল মিহিরদের স্কুলের প্রতিটি ছেলেই শুধুমাত্র নন্দিতাদের স্কুলের মেয়েদেরই বাতিল করছে, অথচ অন্য স্কুলের মেয়েরা যখন ডাকছে তখন হাসিমুখে নাচে যাচ্ছে। মিহিরও গিয়ে অন্য স্কুলের একটি মেয়ের সঙ্গে একদফা নেচে এলো। অপমানে নন্দিতাদের স্কুলের মেয়েদের মুখ লাল। হেড প্রিফেক্টকে জানাল, তারা চলে যাচ্ছে, ডিনারেও থাকবে না। হেড-প্রিফেক্ট ডোরা জোন্সও কিছু একটা আঁচ করেছিল। সে আবার মিহিরের প্রচণ্ড ফ্যান। নন্দিতা দেখল, ডোরা মিহিরকে একপাশে ডেকে নিয়ে এ ব্যাপারেই কিছু জিগেস করছে। মিহির কি বলতে ডোরা অবাক হয়ে নন্দিতার দিকে ঘুরে তাকাল, তারপর হাত তুলে ওকে ডাকল।

কিছু না বুঝেই নন্দিতা এগিয়ে এসেছে।

ডোরা বলল, মিহির বলছে তোমার জন্যেই ওরা আমাদের স্কুলের মেয়েদের বয়কট করেছে···হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার? ইউ শুড নট অ্যালাও এনি পার্সোনাল ফিলিং টু স্পয়েল দিস স্যোশাল! ইউ শুড সেটল্ দিস ইওরসেলফ!

হতভম্ব নন্দিতা কিছু জবাব দেবার আগেই মিহির বলে উঠল, ও ডোরা! ইউ আর সিম্পলি মিস্টেকেন, আমি কখনোই বলিনি, "নন্দিতার জন্যে"···শী ইজ জাস্ট দ্য এফেক্ট, নট দ্য কজ—

ডোরা এবার মিহিরকেই ধরেছে, দেন প্লিজ ডোন্ট স্পয়েল দিস ইভনিং, কী হয়েছে বা কোথায় তোমাদের অসুবিধে আমাকে খুলে বল। আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু সলভ্ ইট।

নন্দিতার বিস্ফারিত চোখের সামনে মিহির বলে গেল, ইউ নো ডোরা, নন্দিতা আর আমি এক পাড়ায় থাকি।—মাঝে-মধ্যে একসঙ্গে খেলাধুলোও করতাম। উই ওয়্যার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস্। ও স্কুল-বাসে ওঠার সময় দেখা হলে হাত নেড়ে উইশ করতাম। পরে জানতে পারি এর জন্যে নন্দিতাকে মিসবিহেভিয়ারের অপরাধে তোমাদের প্রিন্সিপাল ওয়ার্নিং দিয়েছেন। আর সেদিন থেকে আমাদের বন্ধুত্বও শেষ।···ন্যাচারেলি আই ওয়াজ ভেরি ভেরি আপসেট। আমার বন্ধুদেরও ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম। তারপর তোমাদের স্কুল থেকে সোশ্যালের এই ইনভিটেশন পেয়ে আমরা খুব ওরিড।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে মিহির চুপ করল।

নন্দিতা আর ডোরা দুজনেই হাঁ করে মিহিরের কথা শুনছিল। ডোরা উৎসুক, কেন, ওরিড কেন?

মিহির দত্তর নিপাট ভাল মানুষের মুখ, ওরিড হব না? যে স্কুলে বন্ধুকে হাত নেড়ে উইশ করাটা মিসবিহেভিয়ারের পর্যায়ে পড়ে, সেই স্কুলের কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে সেখানকারই ছাত্রীদের কাঁধ ধরে নাচাটা কোন্ দরের অপরাধ হবে বুঝতে পারিনি যে! সেই ভয়েই তো তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে নাচতে রিফিউজ করেছি।

ডোরার মুখ লাল, কিন্তু আমি শুনেছি নন্দিতা তোমাকে ভেংচি কেটেছিল, শী শুডনট হ্যাভ ডান দ্যাট হোয়েন শী ওয়াজ ইন স্কুল-বাস।

মিহির সাদা-সাপটা জবাব দিল, এক একজনের এক এক রকম করে উইশ করার রীতি। ও আমাকে বরাবরই ওই ভাবে উইশ ব্যাক করে। তার সঙ্গে স্কুল বা স্কুল-বাসের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। আমার শেষ কথা, তোমাদের স্কুলের জন্যেই আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে। আই ওয়াজ ভেরি আপসেট ফর দ্যাট, অ্যাণ্ড স্টিল আই অ্যাম ইন আ ভেরি ভেরি অফ্ মুড।

নন্দিতা হাঁ। কিন্তু ডোরাই যেন ফাঁপরে পড়ল, এতদিন আগের ব্যাপার, এর জন্যে এখন কি-ই বা করতে পারি!···ভাবল

একটু, তারপর নন্দিতার দিকে ফিরল।—নন্দিতা, তুমিই ব্যাপারটা মিউচুয়াল কর—শেক হ্যান্ডস্ অ্যাণ্ড সে সরি টু হিম।

হেড প্রিফেক্টর নির্দেশ স্কুলের ছাত্রীরা মানতে বাধ্য। নন্দিতাকে হাত বাড়াতেই হল। কিন্তু মিহিরের দুটো হাতই ট্রাউজার্সের পকেটে। সাফ জবাব দিল, আমি এভাবে মিউচুয়াল করব না।

অপমানে এবার নন্দিতার চোখে জল এসেছে। ডোরাও কি করবে বুঝতে পারছে না। এই স্যোশালের পুরো দায়িত্ব তার ওপর। তাড়াতাড়ি একটা কিছু মিউচুয়াল না করাতে পারলে এই স্কুলের মেয়েরা চলে যাবে। এরকম আর কখনো হয়নি। অসহায় মুখে ডোরাই মিহিরকে ধরল এবার, প্লিজ মিহির, ফেয়ারওয়েল পার্টিতে এ ধরনের আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশান ক্রিয়েট ক'র না, লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেন্ডস্। তুমিই বলে দাও ব্যাপারটাকে মেণ্ড করার জন্যে আমি কি করতে পারি···।

মিহির এতক্ষণে নন্দিতার দিকে সরাসরি তাকাল। ঠোঁটে চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তারপর ডোরার দিকে ফিরল, এই মিউজিক নাম্বার শেষ হলেই তুমি ফ্লোরে গিয়ে অ্যানাউন্স কর, অ্যাজ আ স্পেশাল কেস, নেক্সট্ রাউণ্ডে আমার স্কুলের ছেলেরা শুধু তোমাদের স্কুলের মেয়েদের সঙ্গেই নাচবে, আর আমি নন্দিতার সঙ্গে নাচব। হেড-প্রিফেক্ট হিসেবে তুমি এটা করতেই পার। তাহলেই মিউচুয়াল হবে।

এরপর কোনোদিকে না তাকিয়ে লম্বা পা ফেলে মিহির তার বন্ধুদের কাছে গিয়ে বসল।

ডোরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। পরের নাম্বারের বাজনা শুরু হবার আগেই মিহিরের কথামত অ্যানাউন্স করেছে। মিহির ওর স্কুলের ছেলেদের ইশারা করতে তারা নন্দিতাদের স্কুলের বিদায়ী ছাত্রীদের কাছে ঘটা করে মাফ চাইল, তারপর তাদের হাত ধরে ফ্লোরে নিয়ে গেল। মিহির নন্দিতার দিকে এগিয়ে এল। নন্দিতা দরদর ঘামছে, মাথা ঝুঁকিয়ে ওকে বাও করল মিহির, তারপর হাত ধরে ফ্লোরে নিয়ে গেল।

ঝমঝম করে মিউজিক বাজছে, অন্য জুটিরা নাচে মশগুল। নন্দিতা এমনিতে মন্দ নাচে না, কিন্তু সেদিন ওর পা দুটো যেন কাঠ। বাজনা কানে যাচ্ছে না এমন কি ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। অবশ্য তার জন্যে খুব একটা অসুবিধেও হচ্ছে না। ওর অবস্থাটা আঁচ করেই যেন নাচের সহজ কায়দায় মিহির ওকে আগলে রেখেছে, আর অনায়াস নিপুণতায় ফ্লোরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব ভাল নাচতে না জানলে সেদিন মিহিরের যে কোনো মুহূর্তে নন্দিতার নড়বড়ে পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথা।···হলের সমস্ত চোখ ওদের দিকে। পুরো গণ্ডগোলটার মূলে যে নন্দিতা, সেটা সবাই বুঝেছে। তার ওপর বন্ধুদের সঙ্গে ডোরার ফিসফিসানি তো এখনো চলছে। রসিয়ে রসিয়ে এই ব্যাপারটাই বলছে নিশ্চয়! নন্দিতার কান-মুখ গরম হয়ে উঠল।

নাচের নাম্বারটা শেষ হওয়া মাত্র শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে কোনোরকমে বাড়ি ফিরেছে নন্দিতা। চেহারা দেখে বাবা-মা অবাক। ওর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন। তাদের উৎকণ্ঠা এক কথায় এড়িয়ে গেছে। বলেছে, বেজায় মাথা ধরেছে, ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে।

নিজের ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়েছে নন্দিতা। প্রথমে রাগে বালিশটাকে কুটিকুটি করতে চেয়েছে, তারপর কেন জানি সেটাকেই বুকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদেছে, তারও পরে একসময় ওটাকেই জাপটে সারা বিছানায় গড়িয়েছে আর নিজের মনেই হেসেছে আর ভেবেছে স্কুলের মেয়েরা এরপর ওকে টিকতে দিলে হয়, বিশেষ করে জয়াটা। সামনের ছুটির পরে স্কুলে যাবে কি করে?

নন্দিতা তখনো জানে না এই সমস্যার সমাধান হয়েই আছে। তার মা শমিতা বোস দার্জিলিংয়ের এক কনভেণ্টে ওকে রাখার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছে।

হ্যাঁ, শমিতা বসুই নন্দিতাকে দার্জিলিংয়ে রেখে এসেছিল। দেখা গেল অনেক আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করা ছিল। বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত, অর্থাৎ বুদ্ধু, দুলালদা, ছায়াদি, ড্রাইভার ছোটেলাল আর তার বউ মোতিয়া—সব্বাই সব জানত। এমন কি বাবা প্রতাপ বোসও জানত! জানত না শুধু নন্দিতা নিজে।

ওই নাচের ঘটনার পরের দিন সকালে চায়ের টেবলে বাবা-মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছিল। আসল লক্ষ্য ছিল বাবাকে মজার ব্যাপারটা শোনানো। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে প্রতিটা কথা না বলা পর্যন্ত নন্দিতার স্বস্তি নেই। লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও মা-ই বরঞ্চ সবকিছু সাদা মনে হজম করতে পারে না। ওকে ঠাণ্ডা গলায় কত কথা শুনিয়েছিল মিহিরের মাথায় খাতার বাড়ি মারা নিয়ে। কিন্তু সব শুনে প্রতাপ বোস হা হা করে হেসে উঠেছিল। অবশ্য স্ত্রী ঠাণ্ডা চোখে কিছু ইশারা করতে ঝপ করে নিজেকে সামলে নিয়ে কাজের দোহাই দিয়ে নিচের অফিস ঘরে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু নন্দিতা স্পষ্ট দেখেছে বাবার মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি চুঁয়ে পড়ছিল। তারপরে তো স্কুলের এই স্যোশালের ঘটনা। ভেবেছিল, সব শুনে মা-ই গম্ভীর হয়ে যাবে আর বাবা হাসি চাপার চেষ্টা করবে।···অবশ্য মিহিরের সঙ্গে সেদিন অত ক্লোজ নাচার ফলে ভেতরে ভেতরে যে কেমন একধরনের অস্বস্তি লাগছিল, আবার স্বপ্নের ঘোরের মত কী রকম এক অদ্ভুত ঝিম ধরছিল সে কথা নন্দিতা মরে গেলেও বাবাকেও বলতে পারবে না। খুব সাদাসিধে ভাবে ওই ছেলের দুষ্টুমির গল্পই শুধু করেছিল। তারপর নিজের মনেই বলেছে, কি করে যে এরপর স্কুলে যাব! জয়াটা তো আমাকে পাগল করে ছাড়বে!

নন্দিতাকে চমকে দিয়ে হাসি হাসি মুখে উত্তরটা দিয়েছিল মা শমিতা বোস!—তোকে আর ওই স্কুলে যেতে হবে না!

নন্দিতা হতভম্ব। —তার মানে?

মানে আবার কি, তোদের এবারের অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে থেকেই দার্জিলিং-এর এক নামজাদা কনভেণ্টে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি! আগে জানালে পরীক্ষাটা খারাপ হতে পারে ভেবে বলিনি।

নন্দিতা তখনো নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, কিন্তু আমার অ্যাডমিশন টেস্ট?

শমিতা বসুর হাসি হাসি মুখ, তোদের স্কুল চার্চের, দার্জিলিং-এর ওই কনভেণ্টও সেই একই চার্চের। তাছাড়া দুই প্রিন্সিপালেরও খুব খাতির। ক্লাস ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত সব রিপোর্ট ওখানকার প্রিন্সিপাল খুঁটিয়ে দেখেছেন। এবারের নাইনে ওঠার রেজাল্টের কপিও তোদের স্কুল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা শুধু তোর একটা ইণ্টারভিউ নেবে, তা তুই তো সেটা ভালই পারবি?

তবু সবকিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না নন্দিতা। কান্না চেপে ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠেছিল, কিন্তু কেন? এর দরকার হল কেন? এবারও আমি সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠেছি, এবারও ইণ্টার-স্কুল ডিবেট কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে এসেছি, প্রিন্সিপালই বা তোমার সঙ্গে ষড় করে আমাকে তাড়াতে রাজি হল কেন? সে নিজে তো আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে!

জবাবে শমিতা বসু এবার গম্ভীর একটু। কেউ তোকে তাড়াচ্ছে না। এটা ক্লাশ নাইন, মাত্র তিনটে বছর হস্টেলে থাকা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়েই আবার বাড়ি চলে আসবি। এর মধ্যে ছুটি-ছাটায় আমি বা তোর বাবা গিয়ে তোকে নিয়ে আসব, কিংবা সকলে মিলে কোথাও বেড়াতে যাব।

নন্দিতা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু কিসের জন্যে তোমার এই ব্যবস্থা আমি জানতে চাই!

শমিতা বোস ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছে, নিশ্চয় জানবি, তোকে নিয়েই ব্যাপার যখন···। প্রথম কথা, তুই আমাদের একটাই মেয়ে। সমবয়সী সঙ্গীসাথীর সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তত কিছুদিন

একসঙ্গে থাকা দরকার। তাছাড়া আমার লেখার চাপ দিন দিন বাড়ছে, মাঝে মাঝে বাইরেও যাওয়া দরকার। এদিকে তোর বাবা নিজের কাজ নিয়ে নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না, আর তোকে এইভাবে একলা রেখে আমি কোথাও যেতেও পারি না···

নন্দিতা ফুঁসে উঠেছিল, ও! তোমার সভাসমিতি, লেখা, বাইরে যাওয়া এসবের জন্যেই তাহলে আমাকে তাড়ানোর প্রয়োজন?

জবাবে কিন্তু মায়ের মুখখানা অদ্ভুত কমনীয় দেখাল এবার! চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে বলল, যা করছি শুধু তোরই ভালর জন্যে করছি, এটা ভাবিস না কেন?

মায়ের এই সুন্দর অথচ ঠাণ্ডা ব্যক্তিত্বকেই সবচেয়ে বেশি ভয় নন্দিতার। যতই নরম গলায় কথা বলুক, এর যে কোনো নড়চড় হবে না সে জানে। তবু শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে প্রতাপ বসুর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাবা! তুমিও সব জানতে, তুমিও?

দুঁদে উকিল প্রতাপ বোস, সে পেছনে থাকলে জুনিয়রদের বুকের পাটা অনেকটাই বাড়ে, সে-ও মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি! কিন্তু কিছু একটা চাপা ক্ষোভে তারও মুখ লাল! বিড় বিড় করে শুধু বলল, আমি মাত্র দু'দিন আগে জেনেছি।···যাক, এত মন খারাপ করছিস কেন, গিয়েই দেখ না কেমন লাগে···আধ-খাওয়া চায়ের কাপ ঠেলে সরিয়ে নিচের অফিসে চলে গিয়েছিল।

না, এ নিয়ে নন্দিতা আর একটি কথাও বলেনি। ওর বদ্ধ ধারণা মা মিহির দত্তর ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করে ওকে গোড়াতেই সরিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে নন্দিতার আরও রোখ চেপে গেল! দার্জিলিং তো আর রাজ্য ছাড়া জায়গা নয়! সেখান থেকে চিঠি কলকাতায় আসে না? মাকে জব্দ করার কথা ভাবতে পারেনি, তাকে এই ষড়যন্ত্রের একজন বলেও চিন্তা করতে পারেনি···যেদিন কলকাতা ছেড়ে এলো তার আগের

রাতে বাবা নিঃশব্দে এসে ওর মাথায় হাত রেখেছিল। ওই শক্ত মানুষটার চোখ থেকে তখন জল পড়ছিল। বাবা ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। নন্দিতা কাঠ হয়ে পড়ে থেকে নিজের কান্না আটকেছে। আর সেই মুহূর্তে মনে মনে ঠিক করেছে ও পুরো-পুরি বাবার মেয়ে হবে। মায়ের এত নাম-ডাক, যা কিনা এতদিন ওরও সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষার জিনিস ছিল, বাবার এই নিঃশব্দ চোখের জলে তা কোথায় ধুয়ে গেল। ভালভাবে সিনিয়র কেম্ব্রিজ আর বি. এ. পাশ করার পর পারলে এম. এ. করবে, কিন্তু ল'টা নিশ্চয় পড়বে। আর তারপর নামজাদা ব্যারিস্টার প্রতাপ বোসের মেয়ে নন্দিতা বোস বাবার অফিসেরই একজন হবে।

স্কুলের তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে গেছে। চিঠিতে মিহিরের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিলই, মধ্যে মধ্যে ছুটি-ছাটায় ও হঠাৎ কয়েকবার দার্জিলিং-এ চলেও এসেছে। ওই ছেলেও এই তিনটে বছর কলকাতায় থাকেনি। কলকাতা-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা আর রেজাল্টের কোনো ঠিক না থাকায় সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেই বম্বের এক নামজাদা কমার্স কলেজে অ্যাকাউনটেন্সিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। আর ফার্স্ট ইয়ারেই চার্টার্ড প্রিলি-মিনারি পরীক্ষায় পাশ করে ওরই বাবার এক বন্ধুর ফার্মে আর্টিকল্‌শিপ জয়েন করেছিল। যতই বজ্জাতি করুক না কেন, সিনিয়র কেম্ব্রিজে হাই ফার্স্ট ডিভিশনই পেয়েছিল মিহির। ইয়ার্কি মেরে এর পুরো ক্রেডিট অবশ্য নন্দিতাকেই দিয়েছে। ঠিক সময়ে মাথায় খাতার বাড়ি দিয়ে মগজ সাফ করে দেওয়ার জন্যেই নাকি এত ভাল রেজাল্টা হয়েছে। ছেলে যে পড়াশুনোতেও এত চৌকস তা নন্দিতা সত্যি প্রথমে বুঝতে পারেনি। সিরিয়াসনেসের ছিটে-ফোঁটা নেই, সারাদিন হৈ-হৈ করে খেলে বেড়ান আর দিনরাত মগজে যত দুষ্টুমি বুদ্ধির চাষ যে ছেলের, সে এত ভাল রেজাল্ট করে কি করে নন্দিতা ভেবে পেত না। মিহির অবশ্য বলত, ওর পড়ার আসল সময় হল গভীর রাতে।

এরপর বি. কম. পরীক্ষায় মিহির অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাসটা ফসকাল। এর সঙ্গে অবশ্য সি. এ-র ইণ্টারমিডিয়েট, আর ফাইনালের একটা গ্রুপ এক এক বারেই পাশ করেছে। কিন্তু আটকেছে দ্বিতীয় গ্রুপে। নন্দিতাকে বুঝিয়েছে সি. এ. পরীক্ষায় এই ফেলটুকু না করাই বরং আশ্চর্যের। পরের বার ঠিক উতরে যাবে। নন্দিতা চিঠিতে রাগ দেখাতে ছাড়েনি। সব রেষারেষি ভুলে মনের দিক থেকে দুজনেই তখন অনেক কাছাকাছি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই তিন বছরে নন্দিতার একবারও বাড়ি আসা হয়নি। চিঠিতে অবশ্য বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগ বরাবর ছিলই। তারাও একবার না একবার এসেছে। কিন্তু ওর বাড়ি যাওয়া যে কোনো না কোনো কারণে আটকে যাচ্ছে তা অত খেয়ালও করেনি তখন। ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ওঠার পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে মা এসে ওকে নিয়ে ছোটমাসি-মেসোর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত বেড়াতে বেরিয়েছে। বাবার কলকাতাতেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার সময় থাকে না, ফলে তার না বেরুনোই স্বাভাবিক। বাবা ছোট্ট চিঠিতে জানিয়েছে, কাজের চাপের জন্যে তার আসা হল না। নানু-মা (বাবার কাছে নন্দিতা বরাবরই নানু-মা) যেন বুড়ো ছেলের ওপর রাগ না করে। সামনের বছর নিশ্চয় আসবে।

নন্দিতা চিঠি পড়ে হেসেছে। কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই বাবা সামনের বছর দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু পরের বছর, অর্থাৎ টেন থেকে ইলেভেন-এ ওঠার পরীক্ষার পর নন্দিতাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি প্রতাপ বোস এসে হাজির। না এসে উপায়ও ছিল না। কারণ শমিতা বোস তখন বাংলাদেশের প্রথম সারির লেখিকা হিসেবে বিদেশের আমন্ত্রণে ইউরোপে। ফলে মা ছাড়া একা বাড়িতে থাকার চিন্তা বাতিল করে নন্দিতা বাবার সঙ্গে উত্তর-ভারত ঘুরে এসেছে।

তাঁর পরের বছর ফাইনাল ইয়ার। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পর স্কুলের পাট গুটিয়ে একেবারে বাড়ি ফেরার কথা। মধ্যে অবশ্য পুজোর ছুটিতে দিন কতকের জন্যে কলকাতা ঘুরে যেতে

পারত, কিন্তু পরীক্ষার ভয়ে নন্দিতা নিজেই তা বাতিল করেছে। মা সেবার দুদিনের জন্যে এসে ওকে দেখে গিয়েছিল।

একেবারে তিন তিনটে বছর পরে নন্দিতা কলকাতায় ফিরেছে। এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিল শমিতা বোস। তাতে নন্দিতা অবাক হয়নি। প্রতাপ বোস ব্যস্ত মানুষ, তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু অবাক হল যখন ছোটেলাল একটা অন্য বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল। সেখানে জীবনেও আসেনি। আরও অবাক ওই বাড়ি থেকে দুলালদা, ছায়াদি, বুদ্ধু বেরিয়ে এসে ওর মালপত্র নিয়ে যেতে। হাঁ করে নন্দিতা গাড়িতেই বসেছিল। মায়ের ডাকে চমক ভাঙল। কি রে, নাম!

এখানে কেন, এটা কার বাড়ি?

আস্তে আস্তে সব জানবি। এখন ভেতরে চল তো আগে।

নন্দিতা আরও অবাক।—কিন্তু এই বাড়ি কবে কেনা হল? আমি তো এখানকার ঠিকানায় কক্ষনো চিঠি দিইনি!···বাবা কোথায়?

তোর বাবা তার পুরনো বাড়িতেই আছে।

নন্দিতা বিমূঢ়। তার মানে? বাবা এখানে থাকে না? বলছি তো আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবি, আয়।

গাড়িতে বসে থেকেই নন্দিতা জিগেস করল, এখানে তাহলে কে থাকে?

আমি, ছায়া আর বুদ্ধু। দুলাল, ছোটেলাল আর মোতিয়া আগের বাড়িতেই তোর বাবার সঙ্গে আছে। তুই আসবি বলে ওরাও আজ এখানে এসেছে।

নন্দিতার মগজে একটা হিসেবের কারিকুরি চলছিল। এ ব্যবস্থা কতদিনের? সোজা মায়ের দিকে তাকাল, ঠিক তিন বছরের বোধহয়?

শমিতা বসুর মুখে একটা দাগও পড়ল না। তেমনি সহজ গলায় জবাব, হ্যাঁ। তোকে হস্টেলে রেখে আসার পর থেকেই।

নন্দিতা দুচোখের ছাঁকনিতে মাকে চুলচেরা করে দেখে নিচ্ছিল।

কিন্তু কোনো রকম বিড়ম্বনার ছিটেফোঁটাও মুখে ছিল না। যেন এরকমই হবার কথা, এটাই স্বাভাবিক। উল্টে মেয়েকেই মৃদু তাড়া লাগাল, তখন থেকে জেরা করে চলেছিস, নেমে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে আগে ঠাণ্ডা হ। তারপর তোর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই থাকবি। যথেষ্ট বড় হয়েছিস, এখন আর আমি কোনো-রকম জোর করব না।

নন্দিতা এরপর নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছে। আরও অবাক হয়েছে মাকে সহজ গলায় ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুনে। ওরই আসার খবর দেওয়া হল।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেছে নন্দিতার। বাবা-মায়ের মধ্যে যে বিরাট একটা কিছু হয়েছে তা জলের মত পরিষ্কার এখন। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, ঘটেছে ও হস্টেলে যাওয়ার আগেই। অথচ ও কিনা এতদিন বোকার মত ভেবেছিল মিহিরের থেকে দূরে সরানোর জন্যেই মা ওকে হস্টেলে দিয়েছে! বোকা, বোকা, দুনিয়ার বোকা নন্দিতা আবার কি না নিজের সাফ মাথার বড়াই করে! ···ওর ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষার আগেই বাবার সঙ্গে মায়ের কিছু একটা নিয়ে বড় রকমের গণ্ডগোল হয়েছে। সেই জন্যেই মা নিঃশব্দে ওর ট্রান্স-ফারের ব্যবস্থা করে ওকে হস্টেলে পাঠিয়েছে। তারপর বুদ্ধু আর ছায়াদিকে নিয়ে বাবাকে ছেড়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছে। সিনেমা আর লেখার দৌলতে এখন নিজের টাকার তো অভাব নেই! আর এই তিন বছর ধরে কোনো না কোনো ছুতোয় ওর কলকাতায় আসাও ঠেকিয়ে রেখেছে। মায়ের প্ল্যানই ছিল একেবারে ফাইনাল পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নন্দিতাকে কিছু বুঝতে দেওয়া হবে না। মা যা যা চেয়েছে ঠিক তাই হয়েছে।

সন্ধের পর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল প্রতাপ বোস, কিন্তু ওপরে ওঠেনি। নিচে থেকে নন্দিতাকে খবর পাঠিয়েছে। আর আশ্চর্য নন্দিতার সঙ্গে সঙ্গে মা-ও নেমে এসেছে। বাবাকে

দেখে বুকের মধ্যে মোচড়ই পড়েছে নন্দিতার। গত বছরেও তাকে এত শ্রান্ত দেখায়নি।

বাবা দু-হাতে ওকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে আর বিড়বিড় করে শুধু বলেছে, নানু-মা, নানু-মা, নানু-মা আমার।

মায়ের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হয়েছে নন্দিতার। বরাবর বাবা হাই ব্লাডপ্রেসারের রুগী। যা-ই ঘটুক না কেন, তা বলে এভাবে লোকটাকে ছেড়ে আসতে পারল? ডিভোর্স যে করেনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, হাতে ঠাকুমার দেওয়া লোহা-বাঁধানো, শেষের বইটাতেও বোস পদবী, তাহলে এমন কি ঘটেছে? অথচ সমস্ত ব্যবস্থাটাই যে মায়ের সে তো দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

শমিতা বোস পেছনে আছে জেনেই নন্দিতা প্রতাপ বোসকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলল, মায়ের সঙ্গে তোমার কি হয়েছে জানি না, আর জানতেও চাই না, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের পুরনো বাড়িতেই থাকব বাবা।

আশ্চর্য, প্রতাপ বোসই সেটা নাকচ করল। ভেতরের আবেগ প্রবল চেষ্টায় দমিয়ে মাথা নাড়ল। না, আমি সারাদিন কাজে ডুবে থাকি, তোর ওখানে একলা একলা না থাকাই ভাল। এখন এখানেই থাক, আমার কাছে যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবি।—ওটাই তো তোর নিজের বাড়ি!

তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেছে। স্ত্রীর দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। শমিতা বোস নির্বিকার আর নন্দিতা নিস্পন্দ খানিকক্ষণ।

নন্দিতা মায়ের সঙ্গেই থেকে গেছে। কিন্তু সহানুভূতির সবটুকুই জমা হয়েছে বাবার দিকে। বরং সেই থেকে মায়ের বহু ব্যাপারই খুব সোজা-সরল ভাবে নেয়নি। যেমন, হারানকাকার ব্যাপারটা। হারান ভট্‌চায্যি প্রতাপ বসুর কলেজের বন্ধু, তার তিনকুলে কেউ নেই। নন্দিতা শুনেছে, বাবার সঙ্গে কখনো

সখনো তাদের বাড়ি এসে থাকত হারানকাকা। অদ্ভুত মেধাবী ছাত্র ছিল নাকি। কিন্তু বি. এ. পাশ করার পর আর পড়লই না। কোথায় একটা চাকরি জোগাড় করে চলে গিয়েছিল। বছর পাঁচ-ছয় বাদে যখন ফিরে এল, তখন সে চাকরিও ছেড়েছে। আর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে গোটা কয়েক বাচ্চা ছেলে, তার পুষ্যি, ওগুলোরও তিন কুলে কেউ নেই। কলকাতার কাছাকাছিই এক জায়গায় কয়েকটা চালাঘর তুলে হারানকাকা ওদের নিয়ে থাকত। জমিটা জলের দরে পেয়ে গিয়েছিল। ওখানেই একটা স্কুলে মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল। ছেলেগুলোকে লেখাপড়া থেকে জুতো সেলাই, সব শেখাত। আর কোথায় কে মরেছে তার সৎকার, কার অসুখ হয়েছে তার ওষুধ, কোন গরীবের ছেলের পড়ার টাকা নেই সেই ব্যবস্থা, তার বাহিনীকে নিয়ে চাঁদা তুলে তুলে এইসব করে বেড়াত। নন্দিতার বাচ্চা বয়সে তার টানেই হারানকাকা ওই পুরনো বাড়িতে আরও বেশি আসত। নন্দিতাও তাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার ওই ছেলে-গুলোকে দুচোক্ষে দেখতে পারত না। কেমন যেন ভিখিরি ভিখিরি মনে হত। হারানকাকা তার এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিল 'হোলি গার্ডেন'। কিন্তু নন্দিতা বলত হারানকাকার গোয়াল। হারান ভট্‌চায্যি কিছু মনে করা দূরে থাক হেসে ওর নামকরণের তারিফ করত আর বলত, ঠিকই বলেছিস নানু-মা, এগুলোর মত গরু আর দুনিয়ায় কোথাও পাবি না। খড় জোটে না, বিচালি জোটে না, তবু দুধ দিতে বললেই এক পায়ে খাড়া।

নন্দিতা তখন কথাগুলোর মানে ঠিক ধরতে পারত না।

ছেলের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। এখন চল্লিশ না বেয়াল্লিশটা ছেলে নিয়ে হারান ভটচায্যি দাপটের সঙ্গে দশের উপকার করে বেড়াচ্ছে। আগের চালাঘরের বদলে এখন সেখানে একতলা লম্বা দালান-কোঠা। চারদিকের খোলা জমিতে চোখ জড়োনোর মতই ফুল আর সবজির বাগান। একদিকে হোগলার ছাউনি দেওয়া সারি সারি পড়ার জায়গা। পেছন দিকে ব্যায়ামের

আখড়া। বছরে নানা জায়গা থেকে মোটা ডোনেশান আসে। টাকা বোধ হয় শমিতা বসুই সবচেয়ে বেশি ঢালে। নন্দিতার ধারণা মায়ের দৌলতেই হারানকাকা সবথেকে বেশি পেট্রন জোগাতে পেরেছে।

মা সেই প্রথম থেকেই তার হারানবাবুর ভক্ত। অনাথ হা-ঘরের ছেলেগুলোকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করার এই চেষ্টাটা মা বরাবরই খুব বড় চোখে দেখত। হারানকাকাও তার হোলি-গার্ডেনের সব ব্যাপারে মায়ের ওপর খুব নির্ভর করত। কতদিন ওকে আর মাকে তার 'পবিত্র বাগান' দেখাতে নিয়ে গেছে, এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কতরকম প্ল্যান করেছে। মায়েরও এত দারুণ আগ্রহ লক্ষ্য করত। আগে নন্দিতার কোনোদিন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন হয়। কারণ, হারানকাকা বাবার বন্ধু হয়েও এখন আর ওবাড়িতে তার কাছে যায় না, অথচ এখানে হামেশাই আসে। মায়ের কাছে আসে। আর মা-ও কক্ষনো পুরনো বাড়িতে পা দেয় না কিন্তু হরদমই হারানকাকুর হোলি-গার্ডেন-এ যাচ্ছে। কখনো বা দু'চারদিন করে থেকেও আসছে। টাকা যে কত ঢালে তা নন্দিতা সঠিক জানে না, জানতে চায়ও না। নিজের রোজ-গারের টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে করুক গে। কিন্তু যার ওপর বিতৃষ্ণায় তার সঙ্গে এক বাড়িতে পর্যন্ত থাকে না, তারই বন্ধুর সঙ্গে এত মাখামাখি নন্দিতার খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। অথচ শমিতা বোসের ব্যবহারে চেষ্টা করেও কোনো রকম ত্রুটি খুঁজে পায় না। হারানকাকার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় মায়ের মুখখানা উৎসাহ-উদ্দীপনায় জ্বল জ্বল করতে দেখে। কিন্তু রাগে গা জ্বলে গেলেও কিছু বলতে পারে না। শমিতা বোসের অতি ঠাণ্ডা আচরণে এমন এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে যা স্পষ্ট নিষেধের মত। চেষ্টা করেও এই ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা যায় না। হারানকাকা অবশ্য এখনো নন্দিতাকে আগের মতই ভালবেসে ডাকাডাকি করে, কিন্তু নন্দিতাই সহজ হতে পারে না, এড়িয়ে যায়। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ওই লোকটার চোখে যে সেটাও ধরা পড়ে

তা বুঝতে পারে। তাই আরও রাগ হয়, আর তার সবটুকু ঝাল গিয়ে পড়ে মায়ের ওপর।

নন্দিতা ইদানীং অনেক সময় মায়ের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করে। শিক্ষিতা মেয়ের আচরণে মাকে অবাক হতে দেখে। এর জন্যে পরোক্ষভাবে হারানকাকাকেই দায়ী করে মনে মনে। হস্টেল ছাড়ার পর থেকে ওর জীবনের যে কোনো বিশেষ দিনে বাবা তো আসেই আর হারানকাকারও যেন সেদিনই আসা চাই-ই। মা-ই নিশ্চয় তাকে ডাকে। বাবা ওর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা তো বলেই না, ফিরেও তাকায় না। মা তেমনি নির্বিকার আর হারানকাকা চোখে ঠোঁটে টিপটিপ হাসি নিয়ে যেন বাচ্চাদের ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে। বাবা যতই সবাইকে উপেক্ষা করুক, নন্দিতার কেন যেন তাকেই ভিতরে ভিতরে পরাস্ত মনে হয়। তখন মা আর হারানকাকা দুজনের ওপরেই মনে মনে জ্বলে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ-এর রেজাল্টের খবর যেদিন পেল সেদিনও এই এক ব্যাপার। ফাইভ পয়েন্টস, অর্থাৎ এইট্টি পার্সেন্টের ওপর নম্বর পেয়েছে, প্রথম দশজনের মধ্যে নিশ্চয় থাকবে। অন্তত তিনটে বিষয়ে লেটার আশা করছে, মার্কশীট এলেই জানতে পারবে। খবরটা পাওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ফোন করেছে। প্রতাপ বোস দারুণ খুশি হয়ে রাতে ভাল রেস্তোরাঁতে ডিনার খাওয়াবে বলেছে। এইদিন অন্তত মায়ের সঙ্গে কোনো রকম অশান্তি করার ইচ্ছে নন্দিতার ছিল না। বরং মাকেও ধরে ডিনারে নিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। শমিতা বোস আপত্তিও করেনি, যাবেও বলেনি। শুধু হেসেছে।

সন্ধেবেলা কলিংবেলের আওয়াজে নন্দিতা তার বাবা এসেছে ভেবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে হারানকাকা মস্ত এক ফুলে তোড়া আর দুটো মোটা মোটা বই হাতে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে; নন্দিতা থমকেই গেছল। ওর কৃতিত্বের খবরটা দিতে মা একটুও দেরি করেনি তাহলে! তক্ষুণি মনে হয়েছিল হারানকাকা চলে যাবার পর যেন বাবা আসে। কিন্তু তা হল না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রতাপ বোস এসে হাজির। ততক্ষণে শমিতা বোস আদর করে হারানবাবুকে ড্রইংরুমে বসিয়েছে আগ্রহ করে তার আনা বই দুটো দেখছে! আর প্রতাপ বোস এসে নন্দিতার গলায় হার পরিয়ে দিল তা যেন চোখেই পড়ল না। নন্দিতার রাগ চড়ছিল। বই আর ফুল পেয়ে হারানকাকাকে প্রণাম করেনি, সকালে রেজাল্টর খবর জানার পর মাকেও না। কিন্তু এখন বাবার দুপায়ে একেবারে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। প্রতাপ বোসের দু'চোখ চিকচিক করছিল। ওর মাথাটা দুহাতে নিজের বুকে চেপে ধরেছে, ধরা গলায় বলেছে, গুড···ভেরি গুড··· আ' অ্যাম সো গ্ল্যাড। বাট মাইন্ড ইউ, ভালর এটা সবে শুরু— ইউ হ্যাভ টু গো এ লং ওয়ে। নন্দিতাকে আদর করে তারপর সহজ ভাবেই দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

বাঃ, চললে কোথায়, আমার ডিনার? অবাক নন্দিতা না বলে পারেনি।

এবার হাসি মুখে প্রতাপ বোস ঘুরে দাঁড়িয়েছে, ইউ শুড নট লিভ হোয়েন ইউ হ্যাভ এ গেস্ট ইন ইওর হাউস। আজ থাক, আর একদিন হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শেষ আশা নিয়ে নন্দিতা মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু না, কোন কথা শুনেছে বলেও মনে হল না। একমনে বই দেখছে। হারানকাকার ঠোঁটে বরাবরের মতই মজা দেখার হাসি।

নন্দিতার প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল। আর ঠিক তক্ষুণি মা বই থেকে মুখ তুলেছে, হারানবাবু, আপনার কি সাজেশান? নানু অনার্সটা কি-সে নিলে ভাল হয়?

দুচোখে আগুন নিয়ে নন্দিতা দেখছিল আর শুনছিল। একটু আগে যে এসেছিল সে ওর বাবা, কিন্তু তাকে এই সাধারণ কথাটা জিগেস করা দূরে থাক, তার অস্তিত্বটাই মায়ের চোখে পড়েনি। আর এখন কিনা হারানবাবু বলে দেবে নন্দিতার কি পড়া উচিত!

নিজেকে সংযত করে ঠান্ডা গলায় নন্দিতা মাকেই ব্যঙ্গ করেছে,

তুমি তো মা! আগে তোমার মতটাই বলে ফেল। ভবিষ্যতে তোমার মত লেখিকা হতে হলে অনার্সটা বোধ হয় বাংলাতেই নেওয়া উচিত?

শমিতা বসুর বাংলায় অনার্স ছিল নন্দিতা জানত। হাতের বইটা টেবলে রেখে শমিতা মেয়ের মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিয়েছিল, লেখিকা হওয়ার জন্যে কোনো কিছুতেই অনার্স নেওয়ার দরকার হয় না! তবে আমার ইচ্ছে ইকনমিক্স-এ বি.এ পড়ে তারপর এম.এআর ল-টা একসঙ্গে করা···কলেজে ঢুকে ডিবেটের অভ্যাসটা ছাড়িস না, ভবিষ্যতে সুবিধে হবে।

রাগ ভুলে নন্দিতা হাঁ খানিকক্ষণ। ঠিক শুনেছে তো? ওর নিজেরও যে ঠিক এই প্ল্যান! মা কি ওর মনের কথা টের পেয়েছে? ···পরক্ষণেই হারানকাকাকে মাথা নেড়ে এই প্রস্তাবে সায় দিতে দেখে সব সংযম তছনছ হয়ে গেল নন্দিতার। অভদ্রের মত মায়ের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, আমি কি পড়ব না পড়ব সেটা ঠিক করার মালিক তুমিও না, হারানকাকুও না। সেটা ঠিক করবে বাবা, শুধু আমার বাবা, বুঝলে? তারপর এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপরেও সারাক্ষণ ধরে মনে হয়েছে অত ভাল পাশের আনন্দটা হারানকাকু আসার জন্যেই মাটি হয়ে গেছে।

ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়েই নন্দিতা বি.এ পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। কিন্তু ওর জীবনের প্রতিটি বিশেষ দিনে হারানকাকা আসবেই, আর শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে একটা বিচ্ছিরি রকম একতরফা ঝগড়াও হবেই। একতরফা, কারণ রাগারাগি যা করার নন্দিতাই করে। শমিতা বোস একটি কথাও বলে না, চুপচাপ দেখে যায় শুধু।

নন্দিতার যখন বি.-এ সেকেন্ড ইয়ার, মিহির তখন চার্টার্ড ফাইনালের দ্বিতীয় গ্রুপটাও পাশ করে কলকাতায় ওর বাবার ফার্মেই জয়েন করেছে। চিঠিপত্রে বরাবরই দুজনের যোগাযোগ

ছিল। কলকাতায় পা দিয়েই মিহির নন্দিতাকে ফোন করেছিল, জানতে চেয়েছিল কোথায় দেখা করবে। মা খুশি হবে না জেনেও নন্দিতা সোজা তাকে এই বাড়িতেই আসতে বলেছিল। কিন্তু মিহির আসার খানিক পরেই দেখা গেছল শমিতা বোস নিজের হাতে জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। মিহিরও অতি পরিচিতের মত হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে জিগেস করেছিল—মাসীমা, কেমন আছেন?

শমিতা বসু তেমনি হেসে মাথা নেড়েছে, ভাল।—তা তুমি তো এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে?

হ্যাঁ, নিজেদের ফার্ম থাকতে আর অন্যের দরজায় ঘুরে মরি কেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে শমিতা বসু—সেই ভাল। তোমার বাবারও বয়েস হচ্ছে, একই লাইন যখন, তুমি পিছনে থাকলে সব দিক থেকেই ভাল। আচ্ছা, তোমরা গল্প কর।

নন্দিতা হাঁ করে দুজনের বাক্যালাপ শুনছিল। মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মিহিরের ওপর চড়াও হয়েছে। ব্যাপারখানা কি? মায়ের সঙ্গে তোমার এত সদ্ভাব কবে থেকে?

মিহিরের মুখে মজা-পাওয়া হাসি। জাস্ট গেস!

···তোমার সঙ্গে মায়ের তাহলে আগেই আলাপ হয়েছিল?

ঠিক তিনবার। অর্থাৎ বম্বে ভায়া কলকাতা হয়ে যতবার তোমার সঙ্গে দার্জিলিংয়ে দেখা করেছি।

নন্দিতা বিমূঢ় খানিক। দার্জিলিংয়ে যাবার আগে তুমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছ?

হ্যাঁ, পুরনো বাড়িতে তোমার বাবার সঙ্গে আর এ বাড়িতে তোমার মায়ের সঙ্গে। আমি চুরির থেকে ডাকাতি বেশি পছন্দ করি, জানান দিয়েই তাদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের তোমাকে কিছু দেবার বা বলার আছে কি না জেনে গেছি। এর থেকেই আমার নাইনথ পেপারের প্রিপারেশন যেটুকু হবার হয়েছে। তাঁরাও সেটা বুঝেছেন আশা করি।

নন্দিতা হাঁ। প্রত্যেকবার মা-বাবাকে বলে গেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ?

তা কেন, বলেছি বেড়াতে যাচ্ছি। দার্জিলিং কি বছর বছর বেড়াতে যাবার জায়গা নয় কি ? মিহিরের মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করেন বলেই মনে হয়, কিন্তু তোমার মা-কে এখনো ঠিক বুঝতে পারি না, শী ইজ টেরিবলি ইন্টেলিজেন্ট···

হেসে উঠতে গিয়েও নন্দিতা কি ভেবে উৎসুক আবার। তুমি তাহলে বরাবরই জানতে যে বাবাকে ছেড়ে মা এখানকার এই বাড়িতে চলে এসেছে ?

মিহির হেসেই মাথা নেড়েছে, জানত।

কিন্তু দার্জিলিংয়ে গিয়ে আমাকে তো তুমি কিছুই বলনি, বা চিঠিতেও কখনো কিছু লেখেনে ?

আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান, কথা দিলে রাখতে চেষ্টা করি, বলব না কথা দিতে হয়েছিল···

নন্দিতা আবারও হাঁ। কথা দিতে হয়েছিল ? কাকে ? মা-কে, না বাবাকে ?

মিহির হেসেই জবাব দিয়েছিল, ইওর ফাদার ওয়াজ নেভার ইন দ্য পিকচার, তোমার মা-কেই কথা দিতে হয়েছিল।···পড়াশুনোয় ব্যাঘাত হবে বলে উনি এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন, সময়ে নিজেই তোমাকে জানাবেন বলেছিলেন।

এরপর নন্দিতা জিগেস না করে পারেনি, বাবা-মায়ের মধ্যে গণ্ডগোলটা ঠিক কি নিয়ে তুমি জানো ?

না। নিজে থেকে না বললে তোমার মা-কে যে কিছু জিগেস করা যায় না তুমি বোঝ না ?

তা আর বোঝে না নন্দিতা! আগে মায়ের এই ঠান্ডা ব্যক্তিত্বটুকু নকল করার চেষ্টাও করেছে কত সময়। কিন্তু এখন শুধুই দেমাক ভাবতে চেষ্টা করে। আবার সেটা যে ঠিক নয়, তাও জানে।

এবার মিহিরও উৎসুক একটু। দরজার দিকে একনজর তাকিয়ে সামনে ঝুঁকে জিগেস করেছে, কিন্তু কি নিয়ে ও'দের মধ্যে গন্ডগোল তা তুমিও জান না ?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, সেরকম কিছু ঘটেছে বলে তো শুনিনি···সময় সময় সময় এত খারাপ লাগে—

মিহির এরপর কথায় কথায় বলেছে, তোমার মাকে যতটুকু দেখেছি বা বুঝেছি তাতে মনে হয় হঠাৎ করে কিছু করে বসার মানুষ উনি নন। আমার ধারণা আসল গন্ডগোলটা অন্য জায়গায়, পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ। তোমার বাবার যত টাকাই থাকুক না কেন ওনার জগৎ তোমার মায়ের থেকে একেবারে আলাদা। তোমার মায়ের শিল্পী মন হয়তো তাঁর প্রফেসনের বাস্তব দিকটাকে বরদাস্ত করতে পারেনি। শুধুই সাদামাঠা হাউসওয়াইফ হলে কোনো ঝামেলাই হত না। তোমার মা-বাবার ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে হয়তো অনেকটাই ফারাক রয়ে গেছে।

ঠিক এই কথাটাই শুনতে চায়নি নন্দিতা। কারণ, ওর নিজের মনেও মাঝে মাঝে এ ধরনেরই একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেয়। বাবার ওপর যে ওর সবচেয়ে টান সেটা টের পেয়ে ওকে ক্ষ্যাপানোর জন্যে মেসোরা এই নিয়ে একসময় কত ঠাট্টাই না করেছে। এঞ্জিনিয়ার বড় মেসো বলত, ছোটবেলায় তাদের স্কুলে একবার 'ফিল-আপ-দ্য-গ্যাপস'এ দিয়েছিল, ডেভিল ইজ দ্য ফাদার অব—। ক্লাশের যে ফার্স্ট বয়, সে লিখেছিল লায়ার্স। বড় মেসো নাকি তার ঠিক পিছনেই ছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এল অক্ষরটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। তখন আন্দাজে গ্যাপের জায়গায় লিখে দিয়েছিল ল'ইয়ার্স—অর্থাৎ, ডেভিল ইজ দ্য ফাদার অব ল'ইয়ার্স। খাতা যখন ফেরত গেল, তখন দেখা গেল মেসো নাকি ওতে তিনে সাড়ে তিন পেয়েছে।···যদিও সবাই জানত পুরো ব্যাপারটাই বানানো, তবু মজা পেয়ে অন্য মাসী-মেসোরা হৈ হৈ করে উঠত। মা-ও হাসত। নন্দিতা যত ক্ষেপত, ওদের তত আনন্দ।

চোখের ডাক্তার মেজো মেসোর ঠাট্টা আরও এক কাঠি সরেস। একটা লোক খুন করেছে। তার খালাস পাবার কোনো পথ নেই। শেষে সে মরীয়া হয়ে এক নামী উকিলের কাছে গিয়ে জিগেস করছে, পাঁচ লক্ষ টাকা থাকলেও কোনো উপায় নেই, জেলে যেতেই হবে? উকিল তাকে এক কথায় নিশ্চিন্ত করেছে। বলেছে, পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতে কাউকে কক্ষনো জেলে যেতে হয় না, লোকটা তো আনন্দে আটখানা। কিন্তু কিছুদিন পরে জেলে সে ঠিকই আছে। তবে পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতে নয়. সেটা ঐ ল'ইয়ারের পকেটে যাওয়ার পর।···নামী ল'ইয়ার তার কথা রেখেছে।

কিন্তু না? মাসী-মেসোদের এই হাসি-ঠাট্টা কি তার মনে কোনো দিন কোনো রকম আঁচড় ফেলেছিল? যার থেকে পরে এই, কি যেন বলেছিল মিহির? হ্যাঁ, পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ?···নিজের মনেই জ্বলে উঠেছে নন্দিতা। কোথায় ছিল এত সূক্ষ্ম পার্সো-নালিটি বোধ, যখন প্রথম আর দ্বিতীয় বইটা ছাপানোর জন্যে বাবা ঘর থেকে টাকা বের করে দিয়েছিল? দিনের পর দিন নিজের হাড় ভাঙা খাটুনির পরেও রাত জেগে লেখা পড়ত, মতামত দিত, কোনো টেকনিকাল বা ডিটেইলের ভুল থাকলে বইপত্র ঘেঁটে ঠিক করে দিত? সপ্তাহে প্রায় চারদিন মাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দিয়ে আসত আর নিয়ে আসত?···ছোট মাসীর কাছে নন্দিতা সবই শুনেছে। আজ নিজের জগৎ তৈরি হয়ে যাবার পরে বুঝি বাবার সবকিছুই খুব মোটা দাগের লাগছে? ওসব পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ-ফ্ল্যাশ কিছু না, এত নাম ডাক হওয়াতে মাকে আসলে স্তুতির মোহতে পেয়েছে। বাইরের কতগুলো আদেখলার হ্যাংলামিই মায়ের মাথাটা খেয়েছে। বাবা কাজের মানুষ। দরকার হলে সাহায্য নিশ্চয় করবে, কিন্তু নিছক সাহিত্য-টাহিত্য তার এত আসেও না বা আর পাঁচজনের মত এ নিয়ে বাড়াবাড়িও করতে পারে না। এ সব করার মত ইচ্ছে আর সময় কোনোটাই নেই। এটাই হয়েছে যত গণ্ডগোলের মূল। লেখিকার উগ্র মস্তিষ্ক তো! তাই পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ, কালচারাল গ্যাপ, এইসব গালভরা কথা চিন্তা

করে নিজের কদর বোঝানোর জন্যে বাবার কাছ থেকে সরে গেছে। আর বাবার এককালের বন্ধু হারানকাকার মত স্কলারকে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারার ফলে দেমাকের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। সুপিরিয়রিটি এয়ার, আর ইগোইজ্‌ম্‌—এই দুটোর শিকার হয়েছে মা।

এরপর এম. এ. আর ল-তে একসঙ্গে ভর্তি হয়েছে নন্দিতা। বাবা খুশি, কিন্তু মায়ের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। অথচ তারও যে এটাই ইচ্ছে ছিল তা তো সেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পরেই জেনেছিল। অবশ্য হারানকাকার সামনে সেদিনের আঙুল তুলে শাসানির পর থেকে শমিতা বোস নন্দিতার পড়াশুনো নিয়ে আর কোনো দিন একটা কোথাও বলেনি। ল-এর প্রথম দুটো পার্টে ফার্স্ট ক্লাশ পেলেও এম. এ.-তে সেটা অল্পের জন্যে ফসকেছে। সেজন্যে অবশ্য নন্দিতা নিজেকেই পুরোপুরি দায়ী করেছে মনে মনে।···মিহিরের জুলুম ইদানীং বেড়েই চলেছিল। ইতিমধ্যে ওর মা মারা গেছে। ফলে সারাদিন বাড়িতে শুধু গোটা কতক কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। ওই দামাল ছেলে তার পুরো সুযোগ নিচ্ছিল। প্রথম প্রথম নন্দিতাকে ফোন করত, ভীষণ শরীর খারাপ, মাথা তুলতে পারছি না, পার তো একবার এসো।

নন্দিতা তক্ষুণি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যেত। কিন্তু একবার নাগালের মধ্যে পেলেই দেখা যেত শরীর খারাপ-টারাপ কিছু না, সব বজ্জাতি। প্রথমবার অবশ্য সত্যিই ঘাড়ে একটা বিচ্ছিরি রকমের কারবাঙ্কল হয়েছিল, সঙ্গে বেশ জ্বর। খবর পেয়ে নন্দিতা গিয়ে দেখে মিহির সোজা হয়ে বসে আছে, যন্ত্রণার চোটে শুতেও পারছে না। তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই মিহির শক্ত দুটো হাতে ওকে আটকাচ্ছে। তারপর বুকে মাথা রেখেছে, মুখ ঘসেছে। নন্দিতা ছিটকে সরে যাবার চেষ্টা করতেই উল্টে ভয় দেখিয়েছে, বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করলে যে কোনো মুহূর্তে ফোঁড়াটা ফেটে

যাবে। ফলে মুখে গালাগাল করা ছাড়া নন্দিতার আর কোনো উপায় ছিল না। মিহির নিঃশব্দে হেসেছে। তারপর ওকে বিছানায় ফেলে ওর ওপরেই আরাম করে উপুড় হয়ে শুয়েছে। নন্দিতা আবারো বড় রকমের একটা ধাক্কা দিতে গিয়েও ফোঁড়ার ভয়ে সামলে গেছে।

এরপর বুকে মুখে সারা গায়ে পুরুষের মায়াবী স্পর্শ আস্তে আস্তে রক্তের মধ্যে ঝিম নেশা এসেছে। নিজের দুটো হাত যে কখন এক সময় ওকে জড়িয়ে ধরেছে, দুটো ঠোঁট ওই দুই ঠোঁটের সঙ্গে সমান তালে জবাব দিয়েছে তা নন্দিতা বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারেনি। আত্মস্থ হবার পর রাগ দেখাতে গিয়ে উল্টে ডবল জব্দ হয়েছে। জামাকাপড় কোনো রকমে টেনেটুনে ঠিক করে এক ঝটকায় নামতে যেতেই মিহির হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়েছে। ঠোঁটে দুষ্টু হাসি, খারাপ লেগেছে ?

চুমুটুমু তো বহু আগে থেকেই একটু চান্স পেলেই খেত। কিন্তু তা বলে বাড়িতে ডেকে এনে এই বাড়াবাড়ি ! নন্দিতা ফুঁসে উঠেছে, খবরদার বলছি, আর কোনোদিন তুমি আমাকে বাড়িতে আসতে বলবে না।

মিহির ভাল মানুষের মত মাথা নেড়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আমাকে ছুঁয়ে বল তো সত্যিই তোমার খারাপ লেগেছে ?

নন্দিতা ওকে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারেনি, ততক্ষণে মিহিরের মুখ আবার ওর মুখের কাছে নেমে এসেছে। দু-চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে গেছে নন্দিতার, ভেজা-ভেজা ঠোঁট নিবিড় আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আর একজনের মুখ যেখানে ছিল সেখানেই থেমে আছে। নন্দিতা অধীর হয়ে চোখ মেলেছে, সেখানে একটাই প্রশ্ন—কি হল ?

মিহির জড়ানো গলায় অস্ফুটে হেসে উঠেছে, কতটা খারাপ লেগেছে দেখছিলাম···। তারপরেই দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সবটুকু প্রাণশক্তি পুরু কঠিন দুই ঠোঁটে শুষে নিয়েছে। ফলে

বাধা দেবার পাট নন্দিতার সেই প্রথম দিন থেকেই শেষ হয়ে গেছে।

এখন তো রীতিমত অপেক্ষা করে থাকে কবে আবার ছুতো-নাতায় ডেকে পাঠাবে। ডাকলে মুখে সাফ না বলে দিলেও কোনো না কোনো অজুহাতে ঠিকই যায়। এই শরীরটার মধ্যে এত তৃষ্ণা এভাবে জমে ছিল তা কি নন্দিতা কখনো আঁচ করতে পেরেছিল! অন্য দিক থেকে কোনোরকম গণ্ডগোলের ভয় না থাকলে কবেই হয়তো নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিত। অবশ্য চূড়ান্ত এগিয়ে আসার সময় পুরুষ হয়েও মিহিরই আগে সংযত হয়েছে। সেই জন্যেই দিনে দিনে মিহিরের ওপর বিশ্বাস আর নির্ভরতা বেড়েছে।

শরীরের এই দুর্বার তৃষ্ণা নিয়ে নন্দিতা অনেক মাথা ঘামিয়েছে। মনের মধ্যে আঁতিপাতি করে চোখ চালিয়েছে। কিন্তু নিজেকে কখনো সস্তা বলে মনে হয়নি। বইয়ের এক একটা শক্ত চ্যাপ্টার যখন কিছুতেই মগজে ভাল ঢুকত না, তখন মিহিরের সঙ্গে আলোচনার ছুতো করে ওদের খালি বাড়িতে যখন তখন চলে যেত। তারপর সেই এক ব্যাপার, ভোগের সমুদ্রে পুরোপুরি ডুবতে গিয়েও মিহির এক সময় ওকে ফিরিয়ে আনত। কিন্তু তাতেই কাজ হত। দু ঘণ্টা ঘরে বই নিয়ে বসে থেকেও যা মাথায় ঢোকেনি এরপর অনায়াসে তা পরিষ্কার হয়ে যেত। লেখাপড়া জানা ব্রাইট মেয়ে নন্দিতা অনেক ভেবেও নিজের বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের এই লাগামছাড়া মূর্তিটাকে মেলাতে পারে নি। পড়ার বই সামনে নিয়ে দিনের পর দিন তিমির-তৃষ্ণায় এক একটা ছবি মনে মনে সযত্নে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু মায়ের চোখ সহজে ফাঁকি দিতে পারেনি। মাকে মাঝে মাঝেই ওর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতে দেখত। নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠত, কি দেখ বল তো?

মা সোজা জবাব দিত, তোকে।

নন্দিতা নিজেই বুঝেছিল, সকলে যা ধরে নিয়েছে এবার তা হবে না, এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাশ থাকবে না। ঠিক তাই। সবাইকে বিশেষ করে বাবাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে। ওদের ব্যাচে যে দুজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে তারাও

হাঁ। তবে ল-র প্রথম দুটো পার্টে একেবারে টায়টায় ফার্স্ট ক্লাশ ছিল। তৃতীয় পার্টের পরীক্ষা দিয়ে নন্দিতা তাই মনে মনে বেশ উতলাই হয়েছিল—এটাতে ফার্স্ট ক্লাশ রাখতে না পারলে সব গেল। শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছে। আজই রেজাল্ট বেরিয়েছে, মিহিরই খবরটা দিয়েছে। তার নন্দিতা নিজের চোখে ফল দেখে এসেছে। আনন্দে আটখানা হয়ে বাবাকে ফোন করেছে। মা বাড়ি নেই বলে তার লেখার টেবলে ছোট চিরকুট রেখেছে। তারপর এই সাজগোজ, মিহিরের জন্যে অপেক্ষা, আর ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ।

নিজের মধ্যে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা। সেই তের বছর বয়স থেকে এই চব্বিশটা বছর পর্যন্ত নিজের সঙ্গে নিজে ঘুরে এল।

এতক্ষণ বিমনা ছিল বলেই হয়তো কলিং বেলের মৃদু টুং টাং প্রথমে শুনতে পায়নি। এবার আরও একটু জোরে বাজতে একেবারে লাফিয়ে উঠল। মিহির এসেছে। চুলের মধ্যে একবার হাত চালাল, শাড়িটা টেনেটুনে একটু ঠিক করে নিল! খুব ভাল করেই জানে ওই ছেলে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়েই দুম করে আগে একটা চুমু খাবে। এত ভাল খবরটা সে-ই যখন দিয়েছে, তখন আজ অন্তত এটা তো তার প্রায় ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের পর্যায়ে পড়ে।

দেরি করে এসেছে বলে চোখে রাগের ঝিলিক আর ভেজা ভেজা ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে দরজা খুলল নন্দিতা। আর তারপরেই শুকনো মাটিতে বড় রকমের একটা আছাড় খেল যেন। মিহির দত্ত নয়, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মোহন চৌধুরী, হারানকাকার গোয়ালের প্রধান মাতব্বর, তার এক নম্বর চেলা।

মিহিরের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল বলেই এই ধাক্কা। নইলে হারানকাকার সঙ্গে বা একা ঐ মূর্তি তো নন্দিতাদের এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই হানা দেয়। আসে অবশ্য মায়ের কাছে। তাদের যত কর্ম উদ্ধারের ব্যাপারে মায়ের থেকে মোটা টাকার চেক, পুরনো জামাকাপড় তো হরদমই পায়। তাছাড়া

মা নানা ধরনের শাঁসালো লোকের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দেয়। নামজাদা লেখিকার কোনরকম কাজে আসতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে এমন কিছু বোকা আর পয়সাঅলা সাহিত্য-প্রেমিকের তো আর দুনিয়ায় অভাব নেই! এই জন্য নন্দিতা আরও দেখতে পারে না মোহনদের। ডোনেশন চাওয়া আর ভিক্ষে করার মধ্যে খুব একটা তফাৎ আছে বলে মনে করে না। শক্ত-সমর্থ ছেলেরা চাঁদা চেয়ে বেড়ালে সেই ছোটবেলা থেকেই কি রকম যেন ভিখিরি-ভিখিরি মনে হত। এদের বেলা তো আরও মনে হয়। হারানকাকার মত একটা ব্রাইট স্কলার যে কোন পাগলামিতে কতগুলো হতভাগাকে কুড়িয়ে এনে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করছে ভগবান জানে। আর এরা তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে। খাওয়া-পরাটা যখন এমনিই জুটছে তখন আর কাজের চেষ্টা করবে কেন? চাঁদা তুলে দশের উপকার করে বেড়াও! এর চেয়ে আরামের আর কি আছে?···শুধু রাগ নয়, এদের দেখলে এক ধরনের বিতৃষ্ণা হয় নন্দিতার। আরও গা জ্বলে মা-কে মদত জোগাতে দেখে। এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গে ওর ভারি মিল। বাবা মুখে কিছু না বললেও ওদের যে একেবারে সহ্য করতে পারে না সেটা নন্দিতা বেশ বুঝতে পারে। এই মোহন চৌধুরীর দিকে তো ফিরেও তাকায় না। অথচ মোহনের বাবা নাকি একসময় প্রতাপ বোসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। নন্দিতার বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় মোহন তাদের পুরনো বাড়িতে অনেকবার এসেছে। তখন অবশ্য একটুও খারাপ লাগত না। বরং বেশ স্মার্ট আর মিষ্টি মনে হত। তারপর ওর বাবা মারা যেতে সবকিছু লাটে তুলে হারানকাকার গোয়ালে গিয়ে ভিড়েছে। পড়াশুনোও নিশ্চয় বিশেষ কিছুই করেনি, তাহলে আর মরতে ওখানে গিয়ে ভিড়ত না। নন্দিতা তো ওর কথা ভুলেই গেছল। হোস্টেল থেকে এ বাড়িতে আসার দিন কতকের মধ্যেই বহু বছর বাদে আবার দেখা। প্রথমে তো চিনতেই পারেনি। চিরাচরিত

প্রার্থীর বেশ। ধুতিটাকে লুঙির মত করে ঘুরিয়ে পরা, গায়ে সাদা ফতুয়া, তার ওপর দিয়ে একটা চাদর জড়ানো। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, পায়ে হাওয়াই চটি, হাতে চাঁদার খাতার মত কি একটা। এরকম মূর্তি দেখলে নন্দিতার মেজাজ এমনিতেই চড়ে। সেদিন আরও চড়েছিল ড্যাবড্যাব করে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে। কোন সুশ্রী স্মার্ট ছেলে এরকম তাকিয়ে থাকলে মেয়েদের মেজাজ বরং খুশিই হয়, কিন্তু এই বেশভূষার মূর্তি হলে আবার সেটাই অসহ্য লাগে। নন্দিতারও তাই লেগেছিল। কড়া করে কিছু বলতে যাবে এমন সময় মা হাজির। মধু ঝরা গলায় বলল, কি হল, ওকে চিনতে পারিসনি? আমাদের মোহন! তোর বাবার আর হারানবাবুর বন্ধু রমেন চৌধুরীর ছেলে। ছোটবেলায় ও বাড়িতে কত এসেছে, এখন হারানবাবুর কাছেই থাকে।

মেজাজ যেটুকু বা পড়ে আসছিল নন্দিতার, এই শেষের কথাটা শুনে আবার চড়ে গেছল। ব্যঙ্গ করে উঠেছিল, কোথায় থাকে সেটা চেহারাতেই বেশ বোঝা গেছে।

শমিতা বোস যথার্থই বিব্রত অসন্তুষ্ট স্বরে মেয়েকে বলেছিল, কি ভাবে যে কথা বলিস!

নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে মাকেই কি বলতে গিয়েও থমকে গেছল। মোহন চৌধুরীর দুচোখ তখনও ওর মুখের ওপর। নন্দিতা মনে মনে স্বীকার না করে পারে নি, এই বেশভূষা বাদ দিলে ছোটবেলার আদল এখনো বেশ খুঁজে পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। চাউনি একেবারে অদ্ভুত সহজ, সুন্দরও। মিহির দত্তর ঝিলিক বা পুরুষের দৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই, অথচ কি স্বচ্ছ ঝকঝকে চোখ! ইচ্ছে করলেই যেন ভেতর সুদ্ধু দেখে নিতে পারে। মোহন চৌধুরী তখন ওকেই কি বলছিল। প্রথমে নন্দিতা খেয়াল করেনি। পরক্ষণেই কথা শুনে বিড়বিড় করে উঠেছে। মোহন হেসে হেসে বলছিল, সেই ছেলেবেলায় ফ্রক পরা

এতটুকু দেখেছি—এত বড় হয়ে গেছে যে চেনাই যায় না এখন।

'তুমি' শুনেই আসলে মেজাজ গরম। নন্দিতাও ইচ্ছে করেই 'তুমি' করে জবাব দিল, তা তুমি তো সেই হাফ-প্যান্টের বয়সেই আটকে আছ দেখছি—কিন্তু তোমাকে বেশ চেনা যাচ্ছে।

মোহন চৌধুরী আর মা দুজনেই হেসে ফেলেছিল। আর তাইতে আরও রাগ নন্দিতার। তারপর যখন শুনেছে কি করা হয় আর মাকে দারুণ উৎসাহে ওদের প্রশংসা করতে আর শেষে মোটা টাকার চেক দিতে দেখেছে, তখন সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছিল নন্দিতার। হারানকাকার গোয়াল তাহলে আজও একই ভাবে চলছে! বাচ্চা ছেলেগুলোকে দিয়ে চাঁদা তোলানোটাই নন্দিতার বিচ্ছিরি লাগত। কিন্তু এই ধাড়ি ধাড়ি ছেলেরাও ওই রাস্তা ধরেছে? হারানকাকার ওপরেই সব থেকে রাগ হয়েছিল নন্দিতার। নিজের জীবনটা তো নষ্ট করলই, জোয়ান ছেলেগুলোকে পর্যন্ত অপদার্থ করে তুলল। এর চেয়ে কুলিগিরি করে দুটো পয়সা রোজগার করা অনেক সম্মানের। নন্দিতা ছোটবেলায় হারানকাকাকে কি ভালই না বাসত, বা এখনও কি হলপ করে বলতে পারবে একেবারেই বাসে না? কিন্তু এই সাধুগিরি আর মায়ের বংশবদ হবার জন্যই নন্দিতার যত আক্রোশ তার ওপর।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে নন্দিতার সবচেয়ে বেশি রাগ মোহনের ওপর। মিহির এসেছে ভেবে চোখে-মুখে-ঠোঁটে কতটা প্রশ্রয় ফুটিয়ে দরজা খুলেছিল নিজে খুব ভাল করেই জানে। ড্যাবডেবে চোখে (হ্যাঁ, এখন রাগের চোটে ড্যাবডেবে চোখই বলে নন্দিতা) তাকিয়ে মোহন চৌধুরীও যে সেটা বুঝতে পেরেছে তাও স্পষ্ট। ওই দুই চোখে কিছুই এড়ায় না। তার ওপর মুচকি হেসে বলল, দেখেই এমন হোঁচট খেলে, আর কাউকে আশা করেছিলে বোধহয়?

সত্যি কথাটা শুনে নন্দিতা আরও ঝলসে উঠল, প্রায় দরজা

থেকেই ওকে বিদেয় করতে চাইল—সে খোঁজে তোমার কি দরকার? মা বাড়ি নেই।

কিন্তু গণ্ডারের চামড়া এ সব লোকের। দিব্বি হেসে বলল, তাহলে অপেক্ষা করি, আপত্তি আছে?

নন্দিতা তেমনি শ্লেষে জবাব দিল, আপত্তি থাকলেও তোমাদের ঠেকানো যাবে?

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বেশ হৃষ্ট মুখে মোহন চৌধুরী ভেতরে ঢুকে সোফায় গা ছেড়ে আরাম করে বসল। নন্দিতাকেও আমন্ত্রণ জানাল, বোস না!

কেন, আমার কাছ থেকে তো কিছু প্রাপ্তির আশা নেই।

তা কি কেউ বলতে পারে? মেয়েদের মন, কখন দয়া হয় কে জানে!

নন্দিতা আরও তেতে উঠল, দয়া! মানুষের দয়া তোমাদের মস্ত সম্বল, না? এভাবে দয়া চেয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না?

মোহন সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর সাদাসাপটা জবাব দিল, লজ্জা করবে কেন, পরের জন্যে দয়া চেয়ে বেড়ানটা মিথ্যে কথার চাষ করা বা জাল-জোচ্চুরির থেকে তো ভাল! তারপর আলতো করে বলল, জিগ্যেস করলে তোমাদের মা-ও বোধহয় এ কথাই বলবেন।

নন্দিতা প্রথমে হতভম্ব। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল, তার মানে? মিথ্যে কথার চাষ বা জালজোচ্চুরি কে করেছে?

কিন্তু এবার মোহন চৌধুরীর দু ঠোঁট একেবারে সেলাই। গভীর মনোযোগে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার দেখছে।

নন্দিতার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। এত সাহস! তাহলে বাবার প্রফেশন নিয়েই কটাক্ষ! তা না হলে মাকে জিগ্যেস করার কথা ওঠে কি করে? মা এইভাবে এদের বাড়িয়েছে! শরীরটা কাঁপছে নন্দিতার, মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

ঠিক তক্ষুণি বাইরে মিহিরের গাড়ির হর্ন। আঃ, গাড়ি

নিয়ে আসার আর দিন পেল না? না বেরুনো পর্যন্ত হর্নটা টিপেই বসে থাকবে। মোহন চৌধুরীকে দুচোখের আগুনে ঝলসে দিয়ে নন্দিতা ছিটকে বেরিয়ে গেল। পারলে আজই হারানকাকার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, আর মায়ের সঙ্গেও। নন্দিতা অনেক সহ্য করেছে, আর না।

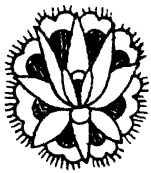

নিজের ঘরে লেখার টেবলের সামনে চুপচাপ বসেছিল শমিতা বোস। মেয়েটা সেই কখন বেরিয়েছে, খালি বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছিল। আজকাল মাঝে মাঝেই অদ্ভুত নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসে তাকে। মেয়ে অবশ্য সঙ্গ বলতে যা বোঝায় কোনদিনই তা দেয় না। তবু বাড়িতে থাকলে এতটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না। আর ঠিক এরকম সময়েই নিজের অতীত যেন ইচ্ছেমত শমিতাকে পিছনে টেনে নিয়ে চলে। ফেলে আসা দিনগুলোকে পরপর সাজানোর মধ্যে যে নেশা আছে, তার চোরা টানে শমিতা বোস কখন একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল।

বাবা সরকারি অফিসের বড় চাকুরে। ছেলে নেই, চার মেয়ে অমিতা, নমিতা, শমিতা আর প্রমিতা। শমিতা তৃতীয়, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই পাকামিতে একেবারে প্রথম। দিদিরা ডেঁপো মেয়ে বলে যখন-তখন শাসন করত। কিন্তু শমির অতটুকু মাথায় কোথা থেকে যে এত প্রশ্ন আসে তা কেউ বোঝার চেষ্টা করত না। সবকিছু ব্যাপারেই শমিতার মন একেবারে গভীরে ডুব দিতে চাইত। ওইটুকু মেয়ের যতসব আজগুবি প্রশ্ন শুনে কেউ হাসত, কেউ পাকামি ভাবত। দিদিরা বরাবরই শেষের দলের। একমাত্র বিশ্বাসের জন ছিল পুমু-প্রতিমা। প্রায় ছ' বছরের ছোট বোন।

বয়সের এতটা ফারাক সত্ত্বেও একমাত্র সে-ই বিশ্বসংসারের যত রকম উদ্ভট কল্পনা তার ছোড়দির মাথায় আসত, সেগুলোকে হাঁ করে গিলত। কিন্তু কখনো কারুর কাছে বলে দিত না। একদিন যে শমিতা বোস (তখন চ্যাটার্জী) নামজাদা লেখিকা হবে, সেই সম্ভাবনার বীজ ছোট্টবেলা থেকেই তার মধ্যে ছিল। আর বাচ্চা বয়স থেকেই তাতে নানাভাবে জল ঢালার কাজটি করেতে ছোট বোন পুমু।

শমিতার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ, তখন মায়ের ভারী-মাস চলছে. পুমু হবে। ওইটুকু মেয়ে যে মায়ের শরীরের পরিবর্তন প্রথম থেকে লক্ষ্য করে এসেছে, কেউ ভাবতেও পারেনি। একদিন দুই দিদিকে নিয়ে বাবার সঙ্গে খেতে বসেছিল, মা ভারী শরীরটাকে টেনে টেনে পরিবেশন করছিল। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে শমি প্রশ্ন করে বসেছিল, আচ্ছা, তোমারা যে বল ঠাকুর আকাশ থেকে পরীদের সঙ্গে ভাই কি বোন পাঠিয়ে দেয়, সেটা কি সত্যি কথা ?

সবাই তটস্থ, এর পরে কি প্রশ্ন আসবে সেই আশঙ্কা। বাবাই উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন ?

মোটেই না ! তাহলে মায়ের পেটের মধ্যে ওটা কি ? রাতে মা যখন আমাকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে তখন আমাকেও ভেতর থেকে ঠ্যালা মারে। আসলে পেটের মধ্যেই বাচ্চা থাকে। সেদিনও তো রাঙাদিদু বলছিল, মাকে দেখেই নাকি বোঝা যায় এবারেও মেয়ে হবে। ঠাকুর যদি পরীদের দিয়েই পাঠাবে, তাহলে মাকে দেখেই ওরা বুঝল কি করে ? ঠাকুর পাঠানোর পরে তো বোঝার কথা।

বাবার বিব্রত মুখ।—ঠাকুর পরীদের দিয়ে আগেই কখনো-সখনো খবর পাঠায়।

সাড়ে পাঁচ বছরের শমি মাথা ঝাঁকিয়েছে, কক্ষনো না ! তাহলে একটু একটু করে মা এরকম দেখতে হয়ে গেল কি করে ? তারপর বিজ্ঞের মত বলেছে, আসলে বাচ্চারা পেটের থেকেই বেরোয়।

আমাদের কালী কুকুরের পেটে যে বাচ্চা থাকে সে কথা তো মা-ই আমাকে কতবার বলেছে! সেই জন্যেই তখন ওকে মারতে মানা করত।

বাবা চুপ। দুই দিদি কিছু বুঝে উঠতে পেরেছিল কি না জানে না। কারণ, বড় অমিতার বয়স তখন এগার আর মেজ নমিতার সাড়ে আট। তবে এই আলোচনাই যে অস্বস্তিকর সেটা বুঝে তারা একবারও মুখ খোলেনি। কিন্তু ছোট শমির মাথায় যখন একবার কিছু ঢুকেছে তখন এর সবটুকু বের করে তবে ছাড়বে। আবার কি বলতে যেতে নিরুপায় হয়ে মা-ই তড়পে উঠেছিল, হাজার দিন বলেছি না খাবার সময় কথা বলবি না?

শমিতা তখনকার মত চুপ করে গেছে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। পুমুর বছর পাঁচেক বয়স হতে এ সমস্যাটা ওকেও বলেছিল। সে-ও এর কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি। কিন্তু তা বলে আর কাউকে বলেও দেয়নি।

শমিতার বয়স যখন সাত সাড়ে সাত, ওর এক জ্যাঠতুতো দিদি একেবারে নিচু ঘরে বিয়ে করে বসেছিল।

তখকার দিন! বাড়িতে হৈ-হৈ কান্ড। সবার মুখে এক কথা, বামুনের মেয়ে হয়ে শেষে এই করলি! ক'দিন শুনে শুনে শেষে শমি মাকে ধরেছে, আচ্ছা মা, আমরা বামুন কেন?

কেন আবার, আমাদের বাবা-ঠাকুর্দা ব্রাহ্মণ বলে!

আমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা ব্রাহ্মণ হল কি করে?

তাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ, তাই।

পূর্বপুরুষ কি করে ব্রাহ্মণ হল?

মা হাল ছেড়েছে, অতশত জানি না বাপু। এই মেয়ে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা, সবেতে কি কেন, কি করে—উফ্।

কিন্তু শমিতার প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি। আবার জিগ্যেস করেছে, তাহলে ঠাকুর করেছে?

হ্যাঁ, সেই করেছে।

বা রে, তোমরাই তো বল ঠাকুরের কাছে সবাই সমান, সবাই তার ছেলেমেয়ে! তাহলে এক ছেলে বামুন, এক ছেলে বদ্যি, আরেক জন কায়েত কি করে হয়?

আমি, বড়দি, বড়ুদি, মেজদি, পুমু—আমরা কি আলাদা?

মা আর কিছু বলতে না পেরে শেষে হাত তুলেছে, দেব এক চড় —বড্ড পেকেছিস।

শমিতা আর কিছু বলেনি। কিন্তু তা বলে ব্যাপারটা ভুলতেও পারেনি। নিজের মনেই এ নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা করেছে।

এইভাবে সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে করতে কখন একসময় আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে শমিতা। দুচোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে চেয়ে দুনিয়াটাকে দেখেছে, কান পেতে সবকিছু শুনতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সহজে আর মুখ খোলেনি। ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই বিচিত্র সব অনুভূতি আর কল্পনা শমির মনের আকাশে ভিড় করে আসত। পুমু একটু বড় হতেই তাকে সেই রূপকথার রাজ্যের সঙ্গী করে নিয়েছে। দোসর ছাড়া একলা মায়াপুরীতে ঘুরতে কি কারুর ভাল লাগে?

শমিতা কখনও বলত, এই পুমু, জানিস আজ আমি সমুদ্র দেখেছি।

পুমুর চোখ ছানাবড়া, কোথায়?

কোথায় আবার, এখানেই! আমি তো চোখ বুজলেই যা ইচ্ছে হয় সব দেখতে পাই। চোখ বোজ, তুইও পাবি। পুমু অনেকক্ষণ চোখ বুজে থেকে শেষে হতাশ হয়ে মাথা নেড়েছে, ছোড়দিভাই, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পাচ্ছিস না! সেকি রে? আচ্ছা আমি বলছি, তুই চোখ বুজে মন দিয়ে শোন আর মনে মনে দেখার চেষ্টা কর। এই যে আকাশটা, এটাকে যদি পায়ের নিচে নামিয়ে আনা যায় তাহলে যেমন হবে, সমুদ্র অনেকটা সেরকম। কি বিরাট! দ্যাখ, চারদিকে শুধু জল আর জল। এখন খুব ভোর তো, সূর্য্যি উঠবে, তাই

নীল রং আস্তে আস্তে কিরকম লালচে হয়ে যাচ্ছে।···এই সূর্য্যি উঠল, ওপরে উঠে গেল। এবার দ্যাখ জলটা কিরকম সোনালি দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এবার ঝড় আনি। আসছে, সারা আকাশ কালো করে কি বিষম ঝড়, বাপরে! সাগর খুব খেপেছে, বড় বড় ঢেউ তুলে খ্যাপা মোষের মত গোঁ গোঁ করে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। দেখছিস? দূর বোকা, ভয় কি! আচ্ছা আচ্ছা—তাহলে ঝড় থামিয়ে দিই। ঠিক আছে, আবার সূর্য্যি ডুবে যাচ্ছে—আস্তে আস্তে আকাশের গা ঘেঁষে সাগরের কোলে কেমন নেমে আসছে। জলটা সেই সকালের মত টকটকে লাল হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? ডুবল ডুবল, এ-ই ডুবে গেল। জল এখন আস্তে আস্তে কালচে হয়ে যাচ্ছে। যাঃ! সব কালো হয়ে গেল।···দেখতে পেলি সমুদ্র?

পুমু চোখ খুলে অবাক মুখে মাথা নেড়েছে। সত্যি! ও-ও সমুদ্র দেখেছে এবার। কিন্তু ছোড়দিটা কি করে যে আগে থেকেই সব দেখতে পায়। বারো বছরের শমিতা তখনও পর্যন্ত সমুদ্র দূরে থাক, বড় গঙ্গাও দেখেনি। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে শুধু কয়েকবার লেকে গেছে। কিন্তু বড় হয়ে যখন সত্যি-কারের সমুদ্র দেখেছে তখন ছোটবেলার সেই কল্পনার সাগরের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ খুঁজে পায়নি।

এই ভাবেই আস্তে আস্তে শমিতা তার নিজস্ব এক জগতে ঢুকেছে। স্কুলে সব থেকে প্রিয় বিষয় ছিল বাংলা, আর তারপর ইংরেজি। ইংরেজিটা নিজে নিজে অত ভাল বুঝত না। কিন্তু বাবা যখন সমস্ত কথার অর্থ বলে দিত, তখন অদ্ভুত ভাল লাগত। বাবা 'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড' কবিতাটা বুঝিয়ে দেবার পর কতদিন শমিতা আর পুমু ঘরের দরজা বন্ধ করে কবিতা কবিতা খেলছে। অর্থাৎ, শমি সেই মৃত সৈনিকের বউ হয়ে পাথরের মত বসে থেকেছে। কবিতার লাইন মত কথা বলে (বাংলায় অবশ্য) পুমু তাকে নানা ভাবে কাঁদাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুঃসহ শোকে শমিতা তখন সত্যিই পাথর, চোখের পাতা পর্যন্ত পড়েনি। শেষে পুমু দুটো

বালিশ ওর কোলে ফেলে দিয়েছে—ও দুটো মৃত যোদ্ধার সন্তান। বালিশ দুটো কোলে নিয়ে শমিতা প্রথমে থরথর করে উঠেছে, তারপর সে দুটোকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে সে কি নিঃশব্দ কান্না! দেখাদেখি পুমুও. ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। বহুক্ষণ পরে দরজায় ঘা পড়তে যখন সংবিৎ ফিরেছে তখন নিজেরাও কম আশ্চর্য হয়নি। সত্যিই তো, কিছুই তো হয়নি। ওই তো মা আর দিদিরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে উতলা মুখে বাবাও। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দুজনে চোখেমুখে জল দিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউই সকলের হাজার প্রশ্নেও একটি কথা মুখ দিয়ে বের করেনি।

বাংলা-ইংরেজি ছাড়া আর কোনো বিষয় শমিতার সেরকম ভাল লাগত না বলে সেগুলো পরীক্ষার আগে কোনো রকমে শুধু পাশ করার জন্য পড়ত। ফলে ইংরেজি বাংলায় ভাল নম্বর পেলেও কোনোদিন সেরকম রেজাল্ট করতে পারেনি। কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য ক্লাসের ফার্স্ট গার্লের চেয়েও ওর কদর বেশী ছিল। লেখার জন্য। শমিতা যখন নিচু ক্লাশে পড়ে তখন একদিন ওদের বাংলা টিচার বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনতে বলেছিল। বিষয়, তোমরা কে কোথায় যেতে চাও। সব মেয়েই কোনো না কোনো জায়গার কথা লিখেছে, সেখানে গিয়ে কি করবে না করবে নিজেদের সাধ্য মত বর্ণনা করেছে। কিন্তু শমিতা চ্যাটার্জী বাদে। রচনা সে-ও লিখেছে বৈকি! সে ও নিশ্চয় কোথাও যেতে চায়। কিন্তু সে যেখানে যেতে চায় দুনিয়ার ম্যাপে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। শমিতা যেতে চায়, 'যেখানে না নেই' এমন এক রূপকথার দেশে। ওর রচনার নামও, 'যেখানে না নেই'। অর্থাৎ এমন এক জায়গার স্বপ্ন দেখে শমিতা, যেখানে কোনোরকম বিধি-নিষেধের বেড়া নেই। এমনকি প্রকৃতিও সেখানে মুক্ত, স্বাধীন। সেই দেশে আকাশ নীল, গাছ সবুজ, মাটিকে খয়েরি হতেই হবে, এমন কোনো কড়াকড়ি নেই। এরা সব তাদের খুশিমত রং পাল্টায়। মাছেরা যখন-তখন

উড়তে পারে, পাখিরা মনের সুখে সাঁতার কেটে আর ফুলের মত ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা যার যার ইচ্ছে মত কাজ করে, যে ছবি আঁকতে ভালবাসে সে শুধু ছবিই আঁকে, যে গান গাইতে চায় সে কেবলই গানই করে, আর একটা মেয়ে এই মজার দেশের নানারকম খুশির কথা দিনরাত প্রাণভরে শুধু লিখেই যায়। বলা বাহুল্য, সেই মেয়ে শমিতা নিজে। এরকম আরো কত অদ্ভুত ব্যাপার ঢুকিয়ে উপসংহারে দুঃখ করে লিখেছে, কিন্তু শমিতা চ্যাটার্জীর শেষ পর্যন্ত কোনোখানেই যাওয়া হবে না। কারণ, 'যেখানে না নেই' এমন কোনো জায়গা এই পৃথিবীর কোথাও নেই।

রচনা পড়ে বাংলা-টিচার অবাক। তারপর ওকে ডেকে প্রশ্ন করেছে, এই আইডিয়া কোথায় পেয়েছ?

শমিতা সত্যি জবাব দিয়েছে, নিজের মাথা থেকে।

কিন্তু সে কথা বাংলা-টিচারের বিশ্বাস হয়নি। শমিতার খাতা নিয়ে সোজা ওদের ক্লাস-টিচারের কাছে গেছে। রচনা পড়ে সে-ও অবাক। তারপর দুজনেই হেডমিস্ট্রেসের ঘরে। এইটুকু মেয়ে, বিশেষ করে যে মেয়ে এতদিন কোনোভাবেই কারুর নজরে আসেনি, সে এই লিখেছে! খানিক পরে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে শমিতার তলব পড়েছে।

এই রচনা তুমি নিজে লিখেছ?

শমিতা ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়েছে। লিখেছে। কেউ দেখিয়ে দেয়নি বা কিছু বলে দেয়নি?

না, শুধু পুমুকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। ও-ও ভাল বলেছ।

পুমু কে?

প্রমিতা চ্যাটার্জী, আমার ছোট বোন। এই স্কুলেই পড়ে, এবার ক্লাশ ওয়ানে উঠবে।

গম্ভীর প্রকৃতির মহিলার ঠোঁটেও এবার হাসি এসেই গেছে। সামলে নিয়ে বলেছে, তোমাকে যদি অন্য কোনো বিষয়ে রচনা দিই তাহলে এখানে বসে লিখতে পারবে?

শমিতা থতমত খেয়েছে একটু, কিন্তু এর পরেই যে অঙ্ক ক্লাস, আর তারপর ভূগোল আর বিজ্ঞান ?

হেড মিস্ট্রেসের চোখ তীক্ষ্ন, ওগুলোর একটাও তোমাকে এখন করতে হবে না। বিন্তু লিখবে এখানে বসে। পারবে ?

একগাল হেসে শমিতা এবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়েছে, পারবে। অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, এই তিনটে বিষয়ই ওর চক্ষুশূল।

রচনার শিরোনাম ছিল, 'তুমি কি হতে চাও।'

এরপর রাশভারী হেডমিস্ট্রেসের উপস্থিতি, সবকিছু ভুলে শমিতার কলম এগিয়ে চলেছে। লিখেছে, এই হতে চাওয়ার কি কোনো শেষ আছে ? বা সবসময় কি কেউ একই জিনিস হতে চায় ? শমিতার তো এক এক সময় এক এক রকম হতে ইচ্ছে করে। যখন মা ছুটির দুপুরগুলোতে জোর করে ঘরে আটকে রাখে তখন পাখি হয়ে জানালা দিয়ে গলে সারা দুনিয়াটা চক্কর খেয়ে আসতে ইচ্ছে করে। আবার যখন লেকের কিনারে গেলেই বাবা হাত টেনে ধরে, তখন টুক করে লাল নীল মাছ হয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যাবার সাধ হয় কিন্তু যখনই মনে হয় পাখিগুলোকে ফাঁদ পেতে ধরে ষন্ডা ষন্ডা লোকগুলো খাঁচায় পুরে বিক্রি করে, বা টেঁপিদি ছোট ছোট জ্যান্ত মাছগুলোতে বেশ করে ছাই মাখিয়ে ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ কুটতে থাকে, তখন পাখি বা মাছ দুটোর একটাও হতে চায় না। আবার কখনো ও অঞ্জলি হতে চায় (অঞ্জলি শমিতাদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়) বিশেষ করে স্কুলের প্রাইজ-ডে'র দিন। কিন্তু যেই মনে হয় অঞ্জলি দিনরাত মুখ গোমড়া করে বই নিয়ে বসে থাকে, খেলে না, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, বা ওকে একেবারেই পাত্তা দেয় না, তখুনি অঞ্জলি হবার ইচ্ছে বরবাদ। কিন্তু একটা ব্যাপারে শমিতা নিশ্চিত—অঙ্ক বা ভূগোল-বিজ্ঞান পরীক্ষার আগে আগে ওর ওদের বাড়ির ঠিকে-ঝি টেঁপিদি হতে ইচ্ছে করে। তবে বাংলা বা ইংরেজি পরীক্ষার আগে এই শমিতাই থাকতে চায়। আবার ক'দিন আগে যেদিন পাড়ার রত্নাদির বিয়ে হল, তখন ও

রত্নাদি হতে চেয়েছিল। কত সাজগোজ, গয়নাগাঁটি, ধুমধাম! কিন্তু পরের দিনই যখন রত্নাদি সবাইকে ছেড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি গেল, তক্ষুণি সে শখ মিটে গেছে। সময়মত একটা ডাক্তার না পাওয়ার জন্য স্কুলের বন্ধু অঞ্জুর ঠাকুমা যখন ধড়ফড় করে মরেই গেল তখন তো শমিতা ঠিকই করে ফেলেছিল বড় হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু তার পরের দিনই যখন বাবা ওদের চার বোনকে টারজানের সিনেমা দেখিয়ে আনল, তখন ক'দিন জেনি, অর্থাৎ টারজানের সঙ্গী সেই সাদা মেয়েটা হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে মন চায়নি। আবার কিছুদিন আগে বাড়ির সামনে একটা পাগলীকে দেখে খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওটার মত হতে। যখন খুশি খাবে, ঘুমুবে, হাসবে, কাঁদবে, নিজের সঙ্গে কথা বলবে—কারুর দিকে ফিরেও তাকাবে না, আর ওকেও কেউ বিরক্ত করবে না। কিন্তু বিকেলবেলা বাচ্চা ছেলেগুলো ওটাকে ইঁট মারতে সে ইচ্ছেও তক্ষুণি উবে গেছে।

···এরকম কত কি-ই তো হতে চেয়েছে বা চায়। কিন্তু সবকিছু কি একবারে হওয়া যায়, না মাত্র একটা জীবনে হয়ে ওঠা যায়? তাই ও আপাতত বাবা-মা-দিদিদের আদরের শমি, পুমুর ছোড়দিভাই আর ইস্কুলের সবার শমিতা চ্যাটার্জী হয়েই থাকতে চায়।

লেখাটা পড়ে হেডমিস্ট্রেস খানিকক্ষণ ক্ষুদে ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। পরের দিন স্কুল শুরু হবার আগে সমস্ত মেয়েদের সামনে ওটা পড়া হয়েছে। তারপর স্কুল-ম্যাগাজিনে দুটো রচনাই ছাপা হয়েছে। শমিতা প্রথমে যেমন অবাক, পরে তেমনই খুশি। ওর রচনার যে কোনোদিন এরকম আদর হতে পারে কখনও ভাবেনি।

সেই থেকে শুরু। মোটামুটি পাশ করে এক একটা ক্লাসে উঠেছে, কিন্তু ওর ব্যাপারে লেখাপড়াটাই গৌণ হয়ে গেছে। স্কুল ম্যাগাজিনে তো বটেই, তারপর থেকে প্রত্যেকটা ইন্টার-

স্কুল রচনা বা গল্প প্রতিযোগিতায় শমিতা চ্যাটার্জীর নাম থাকবেই। আর তার মানেই একটা না একটা প্রাইজ স্কুল পাবেই। পরের তিনটে বছর জুনিয়র গ্রুপ ইন্টার স্কুল প্রতি-যোগিতায় শমিতা রচনা লিখে দুবার দ্বিতীয় আর একবার প্রথম হয়েছে। তার পরের দুটো বছর সিনিয়র গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে ছোট গল্প লিখে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে এসেছে। ফলে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস থেকে শুরু করে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে পর্যন্ত ও বিশেষ একজন।

এরপর শমিতার লেখা নিয়ে হৈ-চৈ যত বেড়েছে, ওর বাইরের আচরণ ঠিক ততো শান্ত হয়ে উঠেছে! কথা বরাবরই কম বলত, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি লেগেই থাকত। এই কমনীয় ব্যক্তিত্বটুকুই ওকে পুরুষের কাছে দিন দিন আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। যে সহজ অথচ ঋজু আচরণে মেয়েদের ভেতরে-বাইরে একধরনের মাধুর্য ঝরে, শমিতা অল্প বয়স থেকেই সত্তার সেই প্রসাদ পেয়ে এসেছে। ফলে সেরকম সুন্দরী না হওয়া সত্ত্বেও লোকের চোখে বরাবর তাকে লোভনীয় মনে হয়েছে, সহজে নাগাল পাওয়া যায় না এমন লোভনীয়। লেখাটা এর সঙ্গে বাড়তি জৌলুস ছড়িয়েছে। শমিতা কখনও কাউকে আঘাত করত না, কটু কথা বলত না, হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত মুখে নিরাপদ ব্যবধান রচনা করত। অবশ্য বি. এ. পড়ার আগে পর্যন্ত সেরকম ভাবে কেউ এগোয়ওনি।

এসব দিকে বরং পুমু অনেক পাকা হয়ে উঠেছিল। প্রায় ছ বছরের ছোট হলেও পড়ত শমিতার থেকে চার ক্লাশ নিচে। ক্লাশ এইট থেকেই হাবভাব অন্যরকম হয়ে উঠল। এক একটা কাণ্ড করত আর হি-হি করে ওর গলা জড়িয়ে ধরে সেই সব গল্প শোনাত। মাঝে মাঝে আবার অনুযোগ করত, তোর লেখার এত মাল-মশলা সাপ্লাই করি অথচ আমাকে নিয়ে কিছু লিখছিস না। তোর গল্পের জন্যেই তো একটার পর একটা প্রেম করে যাচ্ছি!

শমিতা রাগের ভান করে ওকে তেড়ে যেত। মনে মনে হাসত। পুমু এ কথা বলতে পারে বটে। তাজা ছটফটে মেয়ে, চার বোনের মধ্যে তো নিশ্চয়ই, এমনিতে সত্যিই সুন্দর। সেই জন্যই শমিতার ভেতরে ভেতরে ওকে নিয়েই যত চিন্তা।

এর মধ্যে দুই দিদির ভাল বিয়ে হয়ে গেছে। এঞ্জিনিয়র বড় জামাইবাবু, এক নামকরা ফার্মে চাকরি করে আর মেজ জন চোখের ডাক্তার, তারও ভালই পশার জমছে। বাবা-মা তখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। তলায় তলায় ওর জন্যও ছেলে খোঁজা শুরু করেছে। শমিতা খুব ভাল করেই জানত পাত্র খোঁজার পালা ওর বেলাতেই শেষ। ছোট মেয়ের জন্য বাবা-মা আর সে অবকাশ পাবে না।

কিন্তু পুমু নয়, ওর নিজের জীবনেই যে অন্যরকম কিছু ঘটতে চলেছে তা কি শমিতা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পেরেছিল?

তখন বি. এ. সেকেন্ড ইয়ার চলছে, বাংলায় অনার্স। কিন্তু পড়াশুনোর থেকে অনেক বেশি মনোযোগ নিজস্ব লেখায়। কলেজ ম্যাগাজিনে তো বটেই, টুকটাক এদিক ওদিকেও তখন কিছু কিছু লেখা বেরুচ্ছিল। সেই সময় এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বিচারক পাঁচজন নামকরা সাহিত্যিক। গল্প লেখার জন্য সময় চার ঘণ্টা। গল্পের স্টাইল কম্পোজিশন, ডায়লগ এসবের জন্যও আলাদা আলাদা নম্বর থাকবে। শমিতা চুপচাপ বিজ্ঞাপনের কাটিং-এর সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা আর বয়েস পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাগবাজারের যে বিরাট বাড়িটাতে এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেটা প্রতাপ বোসের ঠাকুর্দার। তারা তখনও কেউ কাউকে চোখের দেখাও দেখেনি। মাস তিনেক পরে প্রতিযোগিতার ফলাফল বেরুতে দেখা গেল শমিতা চ্যাটার্জী প্রথম। শুধু তাই নয়, থিম স্টাইল ইত্যাদির আলাদা বিচারের প্রত্যেকটাতেই ওর নম্বরই সব থেকে বেশি। কলেজে

ওকে নিয়ে আবার একদফা হৈ-চৈ। প্রিন্সিপাল নিজে ডেকে কংগ্রাচুলেট করেছে। পুমু তো আনন্দে ওকে ধরে জাপটা-জাপটি করেছে। বাবা-মা, দিদি-জামাইবাবুরা সব্বাই খুব খুশি। শুধু একজন বাদে। শমিতা নিজে। একমাত্র ওই শুধু জানত বিচার পুরোপুরি ঠিক হয়নি, আর সেই জন্যও দায়ী একমাত্র ও-ই।

নির্ধারিত দিনে প্রাইজ আনতে গেছল, সঙ্গে পুমু। বিরাট হল ভাড়া করে চমৎকার করে স্টেজ সাজিয়ে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা। তারপর নাচ-গান-নাটকের প্রোগ্রাম। পুরস্কার বিজয়ীদের উৎসাহ দিতে নামী লেখক-লেখিকারা উপস্থিত। বিপুল হাততালির মধ্যে শমিতা তিনটে মেডেল নিয়েছে, একটা ফার্স্ট হবার জন্য, একটা আলাদা-আলাদা প্রত্যেকটা ভাগের বিচারে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার দরুন, আর তৃতীয়টা এক নামজাদা সাহিত্যিক খুশি হয়ে দিলেন। শমিতা পুরস্কার নিয়ে নেমে আসতে আসতে ওর মুখের ওপর ঝপাঝপ ফ্ল্যাশ চমকাল, কে একজন কিছু বলার জন্য ওর মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরল। এড়িয়ে যেতে গিয়েও শমিতা শান্ত গলায় একটিমাত্র পংক্তি আবৃত্তি করল, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'। অনেকে খুশি হয়ে হেসে উঠল। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসতেই বিচ্ছিন্ন অথচ চাপা একটি গমগমে গলা শোনা গেল, রাইট।—সাজে না।

শমিতা মুখ তুলতেই তার ঠিক সামনের গেস্ট চেয়ারে যার সঙ্গে চোখাচোখি, সে প্রতাপ বোস। কথাটা সে-ই বলেছে।

নির্লিপ্ত অবহেলায় শমিতা মুখ ফেরাতে গিয়েও পারল না। মনে অস্বস্তি। চোখে চোখ মিলল, কিন্তু অন্য চোখ জোড়ার পাতাটুক পর্যন্ত নড়ল না। পুরুষের চাউনি এ পর্যন্ত শমিতা অনেক দেখেছে। নিজে লেখে, তাই এ নিয়ে মনে মনে বিশ্লেষণও কম করে না। চোরা চাউনি, লোভের চিকচিকানি, সম্ভ্রম ছোঁয়া আকর্ষণ, যা ওকে এতদিন ছেঁকে ছেঁকে ধরেছে তার কোনোটার সঙ্গেই ওই চোখ জোড়াকে মেলানো গেল না।

শমিতা এবার পুরো মানুষটাকেই দেখল। বেশ লম্বা, চওড়া বলিষ্ঠ কাঁধ, চৌকো মুখ, পুরু ঠোঁট। একমাথা চুলের নিচে বড় কপাল, ছোটর ওপরে খাড়া নাক আর কালো ফ্রেমের ভারী চশমার ওদিকে তরুণ দুটো চোখ। বছর সাতাশ-আঠাশ হবে। কোনো ভণিতা না করে বলল, আমার নাম প্রতাপ বোস। ও কথাটা যে বললাম, তার কারণ আছে। শোনার সময় হবে?

হকচকিয়ে গিয়ে শমিতা আবারো তাকাল। ততক্ষণে আরও অনেক লোক মজা পেয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে। ব্যস্ত হয়ে শমিতা পুমুকে খুঁজল। পুমু তার চেয়ার ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। ও কাছে আসতে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার প্রতাপ বোসের দিকে তাকাল।

ভারী গলায় প্রতাপ বোস বলল, বাইরে আসুন, এঁরা ডিস্টার্বড্ হচ্ছেন। বলেই লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগোল।

পুমু হাঁ করে ছোড়দিকে আর ওই লোকটাকে দেখছিল। তার হাত ধরে শমিতা হল থেকে বেরিয়ে এলো। কেন যেন ওই লোকটার চোখ এড়িয়ে পালিয়েই যেতে ইচ্ছে করছে। তাকে কেমন নির্দয় গোছের মনে হচ্ছে।

কিন্তু প্রতাপ বোস বাইরের দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে। শমিতার সঙ্গে পুমুকে ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার বোন?

শমিতা মাথা নেড়েছে। পুমু চোখ গোল করে চেয়ে আছে।

প্রতাপ বোস শমিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। —আপনারা নেক্সট প্রোগ্রাম দেখবেন না?

না, বাড়ি যাব, কি বলবেন?

বলছি। আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

না, ট্রামে যাব, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দেরি হবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, পৌঁছে দেব। পুমুর দিকে ফিরল। আঙুল তুলে সামনেই পার্ক করা একটা সাদা ফিয়েট দেখিয়ে বলল, তুমি ওই গাড়িতে গিয়ে বোস, আমি তোমার দিদির সঙ্গে দুটো কথা বলেই আসছি। ওখান থেকেই ভারী গলায় হাঁক দিল-ছোটেলাল!

ব্যস্তসমস্ত ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিতে হতভম্ব পুমু ওদের দিকে চোখ রেখেই গাড়ির দিকে এগোল।

ব্যাপারটা এত সহজে ঘটে গেল যে শমিতা আপত্তি করারও সুযোগ পেল না। প্রতাপ বোস পায়ে পায়ে গাড়ির উল্টো দিকে যেতে নিজের অগোচরে শমিতাও সেদিকে চলল। ও যেন নিজের ওপর দখল হারিয়েছে। প্রতাপ বোস আরও একটু এগিয়ে সামনের একটা সাদা পাথরের বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা আবছা অন্ধকার। শমিতার তা চোখে পড়েও পড়ল না। ওর যেন না গিয়ে উপায় নেই।

শমিতা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে প্রতাপ বোস একটু নরম গলায় বলল, সকলের অত প্রশংসার মধ্যে আমি হঠাৎ ও কথা বলে উঠতে আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হয়েছে?

শমিতা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, কি বলার জন্যে ডেকেছেন বলুন।

মুখের দিকে সোজা হয়ে প্রতাপ বোস হাসল একটু। দেখুন, আমি আইনের ছাত্র। তাছাড়া মাঝে ক'বছর বিদেশে থাকাতে বাংলা সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করার তেমন সুযোগ হয়নি। অনেককাল বাদে আজ সুভেনিরে আপনার এই প্রাইজ পাওয়া গল্পটা পড়লাম। লেখা সত্যিই সুন্দর, কিন্তু এর সবটাই কি আপনার নিজস্ব?

শমিতা প্রায় দম বন্ধ করে চেয়ে আছে।

ভারী গলায় প্রতাপ বোস এবার একটি একটি করে বলল, 'হোয়েনএভার ম্যান কমিট্‌স্‌ এ ক্রাইম হেভেন ফাইণ্ডস-এ

উইট্‌নেস।' আপনার গল্পে দেখলাম পুরনো দিনের ইংরেজ নভেলিস্ট বুল্‌ওয়েরে-এর এই কোটেশন কায়দা করে বাংলায় তর্জমা করে আপনিও স্বর্গ থেকে সাক্ষী নামিয়ে এনেছেন. অপরাধীর বিবেকেই শেষ পর্যন্ত তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। শমিতার মুখের ওপর দুচোখ রেখে প্রতাপ বোস সামান্য একটু ঝুঁকলো।—গল্পটা আপনার হতে পারে, কিন্তু গল্পের থিমটা সম্পূর্ণ আপনার কি?

শমিতার পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। লোকটার অভিযোগ মিথ্যে নয়। মেডেলগুলো হাতে নেবার পর ও ঠিক এই কারণেই বলেছিল, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'।···ওদের গল্পের বিষয় ছিল অদ্ভুত—'শাস্তি'। কি রকম শাস্তি বা কেন শাস্তি তার কোনো নির্দেশ ছিল না। চার ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টা শমিতা কাগজে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। হঠাৎই ওই ইংরেজি কোটেশানটা মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। তারপর গল্প আপনিই এসেছে। আর গল্পের শেষে চালাকি করে ওই কোটেশানটাও বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছিল।

বুঝতে চেষ্টা করে শমিতা ঈষৎ রূঢ় গলাতেই বলে উঠল, আপনার কি ধারণা কোনো আইডিয়া থেকে নিজস্ব গল্প তৈরি করাটাও চুরি?

তা তো বলিনি। থিম-এর জন্যে আলাদা করে হাইয়েস্ট নম্বর না পেলে আমার কিছুই বলার ছিল না।

শমিতা আরো শক্ত গলায় বলে উঠল, সে কথা আপনি ফাংশন-অর্গ্যানাইজারদের বললেন না কেন? এ-সব বলার জন্যে কেন আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?

প্রতাপ বোস এবার অম্লানবদনে জবাব দিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করার এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা বলে।

শমিতা থমকে তাকাল। তারপর বলে উঠল, চোর বানিয়ে আলাপ?

প্রতাপ বোস হাসছে। চোর বানিয়ে নয়, উইক-পয়েন্ট ধরে

দিয়ে। মনে করুন এর বদলে এখান থেকে এনে যদি বলতাম, আপনার গল্প খুব ভাল লেগেছে আর সেই সঙ্গে আপনাকেও, সেটা কি খুব ভাল কথা হত ?

জবাবে একটা উষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে শমিতা হনহন করে গাড়ির কাছে এলো।—এই পুমু, নেমে আয়।

হুকুম শুনে পুমু হাঁ। তার পরেই ছোড়দির পেছন থেকে ভারী গলা কানে এলো, নামতে হবে না। বোসো।

প্রতাপ বোস শমিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। গম্ভীর। কারো উইক-পয়েন্ট ধরে দিলে রাগের বদলে তার খুশিই হওয়া উচিত। ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে হুকুম দিল, ছোটলাল, এঁরা যেখানে যাবেন পেঁছে দিয়ে আবার এখানেই ফিরে এসো, আমি ভেতরেই আছি।

শমিতা এবারে অপ্রস্তুত একটু। লোকটার সঙ্গে ওরকম কথা-বার্তার ফলে অন্যের থিম-এ গল্প লেখার দরুন বিবেকের কাঁটাটা বুকে আর খচখচ করে বিঁধছিল না। বরং হাল্কা লাগছিল। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে বলল, আপনি যাবেন না ?

ওর মুখের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করে প্রতাপ বোস হাসল একটু। বলল, যেখানে আপনাদের গল্পের কম্পিটিশন হয়েছিল সেটা আমাদেরই বাড়ি, সেই সুবাদে আজ আমি এদের স্পেশাল গেস্ট, আমার চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দিল, উঠুন।

গাড়ি চলতে পুমু প্রায় ঘুরে বসে কলকল করে কি বলতে যেতেই শমিতা নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ইশারায় ড্রাইভারকে দেখিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। ফলে হাঁটুর ওপর পুমুর রাম-চিমটি একটা। ফিসফিস করে বলল, ছোড়দি, লোকটা কে ?

সামনের দিকে তাকিয়ে শমিতার চাপা শাসন, জানি না। চুপ করে থাক এখন।

পুমু তবু নাছোড়। অন্ধকারে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা

বললি, আমাদের পেঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ছেড়ে দিল, আর কে তুই জানিস না? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, অ্যাঁ?

শমিতা খুব চাপা গলায় ধমকে উঠল, আঃ! চুপ করবি!

পুমু এরপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। কিন্তু কৌতূহলে ফেটে পড়ছে। একটু বাদে শমিতার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে প্রায় মুখ লাগিয়ে বলল, তোর পছন্দ আছে, লোকটা দারুণ ম্যানলি!

শমিতা ওকে ঠেলে সরাল। কিন্তু তার নিজের ভেতরেও একপ্রস্থ নাড়াচাড়া পড়েছে সন্দেহ নেই। মানুষটার হাবভাব কথাবার্তা জোরালো বটে···প্রতাপ বোস···নামের সঙ্গে চেহারা মেলে···গলাখানাও। স্বীকার করতে না চাইলেও শমিতার মনে হল, ওর জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ এসেছে।

আশ্চর্য, রাতে শমিতা ভাল করে ঘুমুতে পারেনি। প্রাইজ পাওয়ার আনন্দ ছাপিয়ে ঘুরে-ফিরে পরের ব্যাপারটাই বারবার মনে আসছিল। বাড়ি ফিরে পুমুর জেরায় জেরায় অস্থির একেবারে। চ্যাটার্জীর মেয়ের বোসের সঙ্গে শেষ ফয়সলা হবে কি করে পুমুর মাথায় এরই মধ্যে সেই চিন্তা। শুনে শমিতার মুখ লাল, কান গরম।

পরের দিন শমিতা কলেজ থেকে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছে। বাবা অফিসে, মা তার ঘরে ঘুমুচ্ছে, পুমুর স্কুল থেকে ফিরতে তখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। শমিতাকে কে যেন প্রায় ঠেলেই বসার ঘরে নিয়ে এলো। সন্তর্পণে দরজা দুটো ভেতর থেকে বন্ধ করে টেলিফোনগাইডটা তুলে নিল। বাড়ি-গাড়ি আছে যখন, তখন ফোন থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতার সুবাদে বাগবাজারের ওই বাড়ির ঠিকানা জানাই ছিল, এখন শুধু বোস টাইটেল দেখে সেটা মিলিয়ে নিয়ে ফোন নম্বরটা পাওয়ার অপেক্ষা। পেল। দুরুদুরু বুকে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই ওদিক থেকে সাড়া পেতে বুকের ভেতর ধক করে উঠল সেই ভারী গলা। শমিতা কাঁপা স্বরে জিগ্যেস করেছে, এটা কি প্রতাপ বোসের বাড়ি

হ্যাঁ, প্রতাপ বোস বলছি।

আমি শমিতা···শমিতা চ্যাটার্জী···

ফোনে খুশির হাসি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল। আমারও কাল থেকে বার বার তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। এ-ই যাঃ! 'তুমি' বলে ফেললাম। তারপরেই হাসি। শুধরে নিয়ে আবার আপনি—আজ্ঞে চালাব?

শমিতার কান গরম। কোনো রকমে বলল, ঠিক আছে, আমি আসলে কালকের ব্যাপারটার জন্যেই ফোন করেছি। কাল আপনার ওপর রাগ করাটা আমার উচিত হয়নি। আপনি বরং আমার উপকারই করেছেন, এ ব্যাপারটার জন্যে আমি নিজেও এতদিন কম কষ্ট পাইনি।

প্রতাপ বোস আবারো হেসে বলেছে, জানি। তোমাকে ওভাবে 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' বলতে শুনেই বুঝেছিলাম। তবু যে ওরকম ব্যবহার করেছি সেটা শুধু আলাপের লোভে। যাক, আমার পারপাস সাক্সেসফুল। এখন তোমার উপকার করার জন্যে কি পুরস্কার দিচ্ছ?

এ কথার জবাব শমিতা একটু হাসি দিয়েই চাপা দিতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু প্রতাপ বোস নাছোড়। শুধু হাসলে চলবে না, গাড়িটা পাঠিয়ে দেব?

শমিতা অবাক। গাড়ি? কেন?

ফোনে মুখ দেখা যায়, না কোনো ফয়সলা হয়?

শমিতা এবার আঁতকেই উঠল, না না! গাড়ি-টাড়ি পাঠাবেন না!

নাঃ, তুমি এত নার্ভাস কেন? আচ্ছা বলতো এরপর আমাদের আর দেখা হবে, না হবে না?

বিপাকে পড়ে শমিতা জবাব দিল, আমি জানি না।

ফোনের ওধারে ওই লোক যেন আরো মজা পেয়ে গেল।

কেন যে ও মরতে ফোন করতে গেছল! ভারী গলা কানের পর্দায় মিষ্টি ধাক্কা দিতে লাগল।—না জানলে তুমি ফোন করতে না। আচ্ছা ধরা যাক, জীবনে আর কোনো দিন দেখা হচ্ছে না, ভাবতে কেমন লাগছে?

শমিতা চকিতে একবার সামনের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তারপর সাহসে ভর করে জবাব দিল, ভাল লাগছে না।

ওধার থেকে এবার জোর হাসি। তাহলে? গাড়ি পাঠাই?

শমিতার ভয় করছে আবার অদ্ভুত রোমাঞ্চও অনুভব করছে।—গাড়ি এলে কোথায় যাব?

কেন, আমার বাড়ি আসবে।

না না, আজ না···রাখি?

প্রতাপ বোস আবারো হেসে উঠল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার ফোন নম্বরটা তো অন্তত দাও।

শমিতা ঘেমে উঠেছে, আমাকে ফোন করতে হবে না, আমিই আবার করব, এখন রাখি। তাড়াতাড়ি ফোনটা নামিয়ে বাঁচল।

পরের দিন কলেজ ছুটি হওয়ার মিনিট পনেরো আগে বেয়ারা এসে খবর দিল কে একজন ওকে ডাকছে। শমিতা অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠল। প্রতাপ বোস। ওর দুরবস্থাটা বুঝেই যেন মিটিমিটি হাসছে।

শমিতা বলল, আপনি? এখানে?

কেন, ছবি সুদ্ধু তোমার সব খবরই তো কাগজে বেরিয়েছিল। আর ক্লাস আছে?

শমিতা মাথা নেড়েছে।—নেই।

তাহলে ছুটি হলেই চলে এসো, আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। ফিরে চলল।

নিরুপায় হয়েই শমিতা এরপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। গেটের বাইরে এসে দেখে এদিন প্রতাপ বোস নিজেই ড্রাইভার। ওকে দেখে হাত বাড়িয়ে পাশের দরজা

খুলে দিল। শমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে বসতে মনের আনন্দে বেশ জোরেই গাড়ি ছোটাল। চালাতে চালাতে দু'একবার ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কি ব্যাপার বল তো? মুখ শুকনো কেন? এত ভয় কিসের?

শমিতা এবার হাসতে চেষ্টা করল। ভয় নয়, আমাদের বাড়িতে এ ধরনের ব্যাপার ঠিক চলে না।

প্রতাপ বোসের ঠোঁটে হাসি। সামনের দিকে চোখ রেখেই আলতো করে জিগ্যেস করল, এ ধরনের মানে? আমাদের এটা কি ধরনের ব্যাপার?

শমিতার কান গরম। শুনতেই পেল না যেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখছে।

প্রতাপ বোস জোরে হেসে উঠল—আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার এদিকে তাকাও।

আরও প্রায় আধ ঘন্টাখানেক বেড়িয়ে শমিতাকে বাড়ি পেঁছে দিয়েছে। বাড়িতে নয়, বাড়ির কাছের বাস স্টপে শমিতা নেমেছে। প্রতাপ বোসের এত তাড়াতাড়ি ওকে ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শমিতা জোর করাতে প্রথম দিন বলেই বোধহয় বেশি চাপ দেয়নি। তবে এরপর থেকে যে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া চলবে না, সে কথাও হাসি মুখে জানিয়ে দিয়েছে। ও গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় সাগ্রহে জানতে চেয়েছে, আবার কবে দেখা হবে! শমিতার বিপন্ন মুখ দেখে নিজেই হেসে আশ্বস্ত করছে, আচ্ছা সে দায়িত্ব আপাতত আমিই নিচ্ছি।

সেই রাতটা শমিতার বড় বিচিত্র কেটেছিল। একই সঙ্গে ভয়-ভাললাগা, দ্বিধা আর আকর্ষণের দোলায় দুলেছে। খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছে গোড়াতেই এটা বন্ধ না করলে পরে ব্যাপার ক্রমশই জটিল হয়ে উঠবে। যতই প্রেমের গল্প লিখুক না কেন, ওদের রক্ষণশীল বাড়িতে এসব কেউ সহজে বরদাস্ত করবে না। বিশেষ করে মা। পুমুকে নিয়েই ভয় সকলের। শমিতার

বিয়েটা দিতে পারলেই মা পুমুকে পার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে সে কথা বহুবার শুনেছে। কিন্তু শমিতাই যে কিছু করে বসতে পারে, এ কেউ চিন্তাও করে পারে না। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও কে যেন ওকে ঠেলেঠেলে প্রতাপ বোসের দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। তার কথাবার্তা, হাসি, অবাধে গাড়ি ছোটানো, চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। সেই রাত কখন ভোর হয়েছিল শমিতা জানে না।

এরপর প্রায়ই দেখা হয়েছে। জানাজানি হলে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হবে বুঝেও দেখা করার তাগিদ শমিতার নিজেরও কিছু কম ছিল না। প্রতাপ বোসের সামনে এলেই ওর সব বাধা কোথায় ভেসে যায়। প্রতাপ বোস যখন-তখন কলেজে হানা দিয়ে জোর করে ওকে বের করে এনেছে। নিজের ওপর শমিতার বরাবরই আস্থা ছিল। কিন্তু সময় বিশেষে অন্য কারুর জুলুমও যে এত ভাল লাগতে পারে জানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, দেখ, এবার ঠিক ফেল করব।

বার কয়েক শোনার পর একদিন প্রতাপ বোস সিরিয়াস মুখ করে জবাব দিয়েছে, চিন্তা কর না, আমার হাতে পড়েছ যখন বিয়ে আর বি. এ. দুই-ই হবে।

শমিতা লজ্জা পেয়েও প্রতাপ বোসকে জব্দ করার জন্যই বলেছে, আর, এম. এ.? সেটার কি হবে?

প্রতাপ বোস ভাল মানুষের মত উত্তর দিয়েছে, একবার বিয়ে হলে মা হতে মেয়েদের আর কতক্ষণ লাগে?

শমিতা বিষম থতমত খেয়েছে। এবার প্রতাপ বোস বিশদ করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ইংরেজি 'এম.' আর 'এ.' অক্ষর দুটো পাশাপাশি সাজালে 'মা' উচ্চারণ হয় না? শমিতার মুখে আর কোন কথা যোগায়নি। ওর দুরবস্থা দেখেই প্রতাপ বোস আরও

মজা পেয়েছে। শমিতা এই লোকের ওপর রাগবে কি, কথাগুলোই যেন স্পর্শ হয়ে ওকে ছেঁকে ধরেছে।

বাড়িতে ফিরতে শমিতার প্রায়ই দেরি হচ্ছিল। সন্দিগ্ধ হয়ে মা-ই বাবাকে আর দিদিদের কিছু বলে থাকবে। ফলে সকলেরই চোখ তখন ওর ওপর। কিন্তু ও বলেই কেউ সরাসরি কিছু জিগ্যেস করে উঠতে পারছিল না। একমাত্র পুমুই ব্যাপারটা জানত। আর ও তো মরে গেলেও ছোড়দির ব্যাপারে মুখ খুলবে না। মাঝখান থেকে তাড়াহুড়ো শমিতার বিয়ের চেষ্টা শুরু হল।

আর কোথাও বিয়ের কথা শমিতা তখন চিন্তাও করতে পারে না। এর মধ্যে প্রতাপ বোস এ দিন ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে সোজা তাদের বাড়িতে এনে হাজির।—মা, দেখে যাও!

মা আসতেই সাদা-সাপটা কথা, এই যে ধরে নিয়ে এলাম।

মা আর শমিতা দুজনেই আঁতকে উঠেছিল। মায়ের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ, ধরে নিয়ে এলাম কি রে?

মানে এখন দেখানোর জন্যে ধরে নিয়ে এলাম, পরে একেবারে নিয়ে আসব।

শমিতা ভেতরে ভেতরে ঘেমে গেছে। প্রতাপের মা হাসি-মুখেই ছেলেকে ধমক দিয়েছে এবার, কি যে কথাবার্তার ছিরি তোর, মেয়েটাকে ঘাবড়ে দিয়েছিস।

শমিতা বুঝেছে, ছেলের কাছে সবই শোনা হয়েছে, শুধু চোখে দেখার অপেক্ষায় ছিল। ছেলের বউ যে পছন্দ হয়েছে তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তারপর প্রতাপ বোসের বাবার সঙ্গেও দেখা হয়েছে, তারও বেশ অন্তরঙ্গ আচরণ।

এর দিনকতকের মধ্যে প্রতাপ বোসের তাগিদ, এবার দু'পক্ষের আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার। শমিতার বিপাকে পড়া মুখ দেখে ঠাট্টা করেছে, তোমার বাড়িতে বলা মুশকিল, আর আমি বাড়িতে বলেই মুশকিলে পড়েছি। তোমার বাবা-মা এখনো

কিছু জানেনই না, আর আমার বাবা-মা সব জানার ফলে দিনরাত তাড়া লাগাচ্ছে।

শমিতা বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুতেই জানাতে পারছিল না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, ও নিজে এসব না মানলেও যারা মানে তাদের বোঝাবে কি করে! এক জ্যাঠতুতো দিদি বহুদিন আগে অন্য জাতে বিয়ে করার ফলে আজও তার সঙ্গে সকলের মুখ দেখাদেখি নেই। বাবা হয়তো বুঝবে, কিন্তু মাকে নিয়েই হবে মুশকিল। জাতের সংস্কার তার মজ্জায় মজ্জায়। শমিতা আজ অবধি এমন কিছু করেনি যা বাড়ির সংস্কারে ঘা পড়ার মত। ভয় নয়, অশান্তির কথা চিন্তা ক'রেই কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পুমুকে কিছু বলা বৃথা। অসুবিধেটা কোথায় তা বুঝবে তো না-ই, বরং দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে এ নিয়ে হৈ-চৈ কাণ্ড বাধাবে। বাবা মায়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে, দিদিদের বাড়ি গিয়ে তাদের দলে টানার চেষ্টা করবে, আর ঠিক এগুলোই শমিতার চিরদিন অপছন্দ।

এর মধ্যে আবার বড় জামাইবাবু তার খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ এনে হাজির। শমিতাকে তারা আগে বহুবার দেখেছে, ফলে নতুন করে মেয়ে দেখার প্রশ্ন নেই। এখন মেয়ে পক্ষের মত থাকলে তারা কথাবার্তায় এগোতে পারে। ছেলে এঞ্জিনিয়ার, সুশ্রী চেহারা, তার ওপর সাহিত্যের অনুরাগী।

মা তো পারলে বিয়েটা তক্ষুণি দিয়ে ফেলে। বেগতিক দেখে শমিতা প্রতাপ বোসকে সব জানাল। শুনে প্রতাপ বোস চুপ একটু। গাড়িটা নির্জন জায়গা দেখে পার্ক করল। তারপর ওর দিকে ঘুরে বসে জিগ্যেস করল, আমি সরে গেলে তুমি অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে?

শমিতা নিজের অগোচরেই কাছে সরে এসে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে।—তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাবে এ আমি ভাবতেও পারি না।

প্রতাপ বোস শমিতাকে আরও কাছে টেনে নিয়েছে। তার দু'হাতে ওর মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট। প্রথম পুরুষ-স্পর্শে শমিতার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছে। প্রতাপ বোস ওর চোখে, গালে, গলায়, ঠোঁটে আদরে আদরে অস্থির করে তুলেছে। সেই সঙ্গে বার বার একই কথা—তুমি আমার, তুমি আমার···ভয় কি? আমি তো আছি।

অব্যক্ত আবেগে শমিতার দু'চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছে। দু'হাতে লোকটাকে আঁকড়ে ধরে তার চওড়া বুকে মুখ গুঁজেছে। এমন আশ্রয় থাকতে আর দ্বিধা কিসের?

সন্ধে গড়িয়ে একটু রাতই হয়েছে সেদিন বাড়ি ফিরতে। নামার সময় প্রতাপ বোস শমিতাকে জিগ্যেস করেছে, তুমি বলবে, না আমিই তোমার বাড়িতে যাব?

শমিতা শান্ত গলায় জবাব দিয়েছে, এবার আমিই বলতে পারব।

রাতে খাওয়ার টেবিলে শমিতা ঠাণ্ডা মুখে বাবা-মাকে জানিয়েছে, বড় জামাইবাবুর আনা সম্বন্ধ বাতিল করতে হবে, সে ওখানে বিয়ে করতে রাজি নয়।

বাবা প্রথমে বিমূঢ় তারপর রাগ করেই বলে উঠেছে, কেন, তারা কি দোষ করল?

শমিতার শান্ত জবাব, তারা কিছু করেনি, দোষ আমারই। আমিই অন্য জায়গায় বিয়ে করব ঠিক করেছি, সেটা তোমাদের আরও আগে আমার জানানো উচিত ছিল।

বাবা-মা দুজনেই নির্বাক খানিকক্ষণ। মুখের ওপর ও এমন কথা বলতে পারে ভাবা যায় না। পুমুও বড় বড় চোখ করে ছোড়দিকে দেখছিল।

অনেকক্ষণ বাদে বাবা খুব গম্ভীর মুখে মাকে বলেছে, ও কি বলতে চায়, কোথায় কাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, সব জেনে নাও। তার পরেই উষ্ণ-গলা, হাঁ করে চেয়ে আছ কি? আধুনিক মেয়ে তোমার, বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তোমার-আমার সেই আদ্যিকালের মতে চলবে?

বাবা খাওয়া শেষ না করে উঠে গেছে।

থমথমে মুখে মা আগে শমিতার কথা শুনেছে। তার পরেই চারখানা হয়ে ফেটে পড়েছে। কায়েতের ঘরে গিয়ে পড়বি তুই? এত বড় হয়েছিস? এত স্বাধীন হয়ে গেছিস? আমরা বেঁচে নেই ভেবেছিস?

অপলক চেয়ে শমিতা মায়ের রাগ দেখেছে। তারপর বলেছে, তোমরা দুঃখ পাবে, তোমাদের সংস্কারে লাগবে আমি জানি মা। যদি মেনে নিতে না পারো, তোমাদের একটা মেয়ে নেই ধরে নাও।

মা আরও জ্বলে উঠেছে, থাকলে নেই ধরে নেব কি করে? এর চেয়ে একেবারে না থাকাই অনেক ভাল ছিল, বুঝলি! তুই কায়েতের ঘরে যাবি আর তারপর পুমুর বিয়ে দেব কি করে ভেবে দেখেছিস?

পুমু খাওয়া থামিয়ে মা আর ছোড়দির কথা শুনছিল। হড়বড় করে বলে উঠল, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেব না মা। বামুন-কায়েত-বদ্যি-মুসলমান-খ্রীস্টান, আমি যাকে আঙুল তুলে ডাকব সেই ছুটে এসে আমাকে বিয়ে করবে। তুমি প্রতাপ বোসের সঙ্গে নিশ্চিন্তে ছোড়দির বিয়ে দিয়ে দাও, দারুণ স্মার্ট ছেলে মা, আর কি হ্যান্ডসাম! আমারই জিভে জল আসে।

রাগ ভুলে মা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে ছোট মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর তেড়ে মারতেই এলো। পুমু ততক্ষণে নাগালের বাইরে। মায়ের চোখে আগুন। শমিতার দিকে ফিরে বলল, এই ছোটটাকে নিয়েই আমার যত ভয় ছিল, তার মধ্যে তুই এমন হলি। তুই?

রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাবার ঘরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, তোমার মেয়ে এক বিলেত-ফেরত উকিল, তারা আবার বোস, তাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। তোমার আস্কারা পেয়েই এই শেষের দুটো মেয়ে এতখানি বেড়েছে। কোথার এঞ্জিনিয়ার আর কোথায়

উকিল, দিনকে রাত করতে পারে, এ বয়সের একটা মেয়েকে ভোলাবে সে আর বেশি কি? আমি আর পারি না, এবার তুমি বোঝ।

শমিতার ভাগ্য ভাল, তার ঠাণ্ডা মাথার বাবা বুঝতেই চাইল। কারণ এই মেয়ের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তার অগাধ আস্থা। মেয়ে যে ছেলেকে বিয়ে করতে চায় সে ব্রাহ্মণ হলে এ বিয়েতে খুশি হয়ে মত দিতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়। অসবর্ণ বিয়ে ইদানীং যথেষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার ভালমন্দ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানোর কারণ ঘটেনি। তাই সম্মতি দিতে নিজের সঙ্গে কিছুটা যুঝতে হয়েছে। তারপর নিজেই ছেলেকে দেখতে আর তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেছে।

সমস্ত দুর্যোগ এত সহজে কেটে যাবে শমিতা কল্পনা করেনি। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেখে মা-ও শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেছে। বড়দি গম্ভীর, বড় জামাইবাবু হেসে হেসেই ঠাট্টা করেছে, শেষে উকিলের প্যাঁচে পড়লে! মেজদি-মেজ জামাই-বাবুও মনে মনে অসন্তুষ্ট। খুশি শুধু পুমু। বড় জামাইবাবু মেজ জামাইবাবুর থেকে ছোড়দির বরকে তার ঢের বেশি ভাল লেগেছে। ওদের মত ভ্যাদাভেদ নয়—দারুণ ম্যানলি।

বিয়ের পরের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেছে শমিতা টের পায়নি। জোর করেই কলেজ যাওয়া বজায় রেখেছিল, বি. এ. পরীক্ষাটা যেভাবেই হোক দিয়ে দেবার ইচ্ছে। কিন্তু পড়াশুনো আদৌ হয়নি। মাঝে মাঝে রাগ করেই ঘরের লোকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বই নিয়ে বসত, কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন ওদিকেই ঠেলে দিত। ও পড়তে বসলে প্রতাপ বোস একটা কোলবালিশ বুকে চেপে ওর দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকত, ওর যে এক লাইনও পড়া হচ্ছে না সেটা বুঝে মিটিমিটি হাসত। তারপর নিঃশব্দে

হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিত। শমিতা রাগ করবে কি! মনে মনে ওরও যে একই প্রতীক্ষা।

বিয়ের পরের মাস থেকেই শরীরের গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। পরের মাসটুকুও একই ব্যতিক্রমের মধ্যে কেটেছে। সন্তান আসছে। শমিতা এত তাড়াতাড়ি ছেলেপুলে চায়নি। বি. এ. পরীক্ষাটা অন্তত দেবে ভেবেছিল, নতুন কিছু লেখাতেও হাত দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। প্রতাপ বোস অবশ্য খুব খুশি। ঠাট্টা করেছে, বলেছিলাম না, একবার 'বি. এ.' বা বিয়েটা হলে 'এম.-এ' অর্থাৎ মা হওয়াটাও জলভাত ব্যাপার।

শমিতা রাগ করতে গিয়েও পারেনি। যে আসছে তার জন্য ও নিজেও কিছু কম দায়ী নয়।

ভারী মাস তখন, একদিন শমিতা বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অলস চোখে রাস্তা দেখছিল। ততদিনে ওরা দক্ষিণ কলকাতার বড় বাড়িটায় চলে এসেছে। হঠাৎ খেয়াল হল, উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা লোক হাঁ করে তার দিকেই চেয়ে আছে। লোকটার পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি, সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত-আট বছরের চারটে ছোট ছেলে। শমিতা ভেবেছে শ্বশুরবাড়ির দুঃস্থ কোনো আত্মীয় হবে। এরকম অনেককে বাগবাজারের বাড়িতে হামেশাই আসতে দেখেত। ততক্ষণে ওই লোক এদিকের ফুটপাথে চলে এসেছে। মাথা উঁচিয়ে নিচ থেকেই জিগ্যেস করল, এটা প্রতাপ বোসের বাড়ি?

সাহায্যের জন্য লোকটা শ্বশুরের খোঁজ না করে তার ছেলের নাম করাতে শমিতা অবাক একটু। এরা সাধারণত শ্বশুরের কাছে আছে। মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ।

লোকটা এবার ইশারায় ওদিকের ফুটপাথ থেকে ছেলেগুলোকে এধারে আসতে বলেছে। আবার ওপর দিকে তাকিয়েছে, প্রতাপ আছে?

শমিতা আবার মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে, না।

ঠিক আছে, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

শমিতা নিচে এসে দেখে লোকটা বাইরের বড় বারান্দায় ছেলে চারটেকে নিয়ে বসে রাছে। ছোটখাট গোলগাল নিরেট ভালমানুষ চেহারা, তার ওপর এই বেশভূষা, সঙ্গে না-খেতে-পাওয়া-গোছের চারটে চার রকম বয়সের ছেলে, এসেছে প্রতাপের কাছেই, বলছেও শুধুই 'প্রতাপ'—শমিতা মাথামুণ্ডু ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতার খাতিরে বাইরের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে বসতে বলেছে। লোকটা গোল গোল দুই মজার চোখে ওকেই বেশ করে দেখছিল, সরাসরি প্রশ্ন করল, প্রতাপ বিয়ে করেছে?

শমিতা থতমত খেয়েছে, হ্যাঁ।

আপনিই ওর স্ত্রী?

এবারে মাথা নেড়ে জবাব, অর্থাৎ তাই।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। অনেক দিন পরে এলাম—

তা মাসীমা মেসোমশাই কি বাগবাজারের বাড়ীতে?

শমিতার বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল। সবাইকেই চেনে।

জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ।

ও! লোকটার গলায় মজার ছোঁয়া। নিজের মনেই বলল, দু দুটো পেল্লায় বাড়িতে মাত্র চারটে লোক, আর এই চারটে বাচ্চার থাকার চার ছটাক জায়গাও নেই।

যাকগে, প্রতাপ ফিরবে কখন?

বলে যায়নি, সাধারণত আটটা হয়।

ও বাবা! আটটার তো এখনো অনেক দেরি। তাহলে চলি। ওকে বলবেন হারান এসেছিল।

শুধু এই বললেই হবে?

লোকটা এবার মুখ খুলেই হেসে উঠেছে, হবার হলে এতেই হবে। তারপর ছেলেগুলোকে ডেকেছে, আয় রে, চল।

বাচ্চাগুলো চলে যেতে গিয়েও কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেছল।

সবচেয়ে ছোটটা শমিতাকে বলেছে, জল খাব।

দিচ্ছি বলে শমিতা তাড়াতাড়ি ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই লোকটা ওকে বাধা দিয়েছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না তো, জলটল কিছু লাগবে না। তারপর বাচ্চাগুলোকে হাসি মুখেই ধমকে উঠেছিল, আবার? আজকে মারই খাবি তোরা। চল!

শমিতার রাগ হয়ে গেলেও মুখের ভাবে ধরা পড়তে দেয়নি। ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, ছোট বাচ্চা, তেষ্টা পেয়েছে, আপনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? একটু দাঁড়ান। লোকটা আবারও দাঁত বের করে হেসে উঠে বলেছিল, এই শীতের অবেলায় এত তেষ্টা পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেন জল চাইছে আপনি বুঝবেন না। তার পরেই তাড়া, এই চল চল!

শমিতার অবাক চোখের সামনে ছেলেগুলোকে নিয়ে চলেই গেছে।

রাতে প্রতাপ বোস ফেরার পর তাকে সব কথা বলতেই সে লাফিয়ে উঠেছে। হারান, হারান এসেছিল? তুমি আমাকে একটা ফোন করতে পারলে না?

থতমত খেয়ে শমিতা বলল, তাকে আর ওই ছেলেগুলোকে দেখে ফোন করার কথা ঠিক মাথায় আসেনি।···কেন, লোকটা কে?

শুনেছে তারপর লোকটা কে। লোকটার নাম হারান ভট্টাচার্য, প্রতাপ বোসের একেবারে ছোট বেলার বন্ধু। বাবা-মা নেই, একটা ভাই ছিল, সেটাও গাড়ি চাপা পড়ে মরাতে তিনকুলে নিজের বলতে আর কেউই নেই। গরীবের ছেলে কিন্তু অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিল। প্রতাপ বসুর বাবাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছেলের স্কুলে ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে প্রতাপ বোস যে দুটি ছেলের সঙ্গে একাত্ম ছিল, তাদের একজন এই হারান ভট্‌চায আর একজন রমেন চৌধুরী। রমেন চৌধুরীকে তো শমিতা খুব ভালই চেনে। কাছেই থাকে। তার মা-মরা ফুটফুটে ছেলে মোহন শমিতার প্রচণ্ড নেওটা, যখন-তখন কাকিমা কাকিমা করে ছুটে আসে।

শমিতা শুনল, এই হারান ভট্‌চাযের জন্যই নাকি তার ঘরের লোকের বি. এ. পাশ করা সম্ভব হয়েছিল।···প্রতাপ বোস নিজেও যথেষ্ট ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু বি. এ পড়ার সময় খেলাধুলো আর পলিটিক্স নিয়ে মেতে ওঠাতে বইয়ের পাতা ওল্টানোরও সময় পায়নি। পরীক্ষার তারিখ জানার পর দেখেছে, সে বছর ভাল রেজাল্ট দূরে থাক, পাশ করারই কোনো আশা নেই। ঠিক করেছিল সেবারটা ড্রপ করবে। কিন্তু বাড়িতে বাবাকে কিছু বলতেও পারছিল না। কারণ ছেলে সম্পর্কে তাঁর বরাবরই বড় আশা। ক্লাসের অন্য ছেলেরা অনেক বুঝিয়েছে, একবার ড্রপ করলে পরের বারটা যে আরও অনিশ্চিত সে, কথা বলে সাবধান করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতাপ বোসের এক কথা, এবার পরীক্ষা দিলে নির্ঘাৎ ফেল। একমাত্র হারানই এ ব্যাপারে কিচ্ছু বলেনি।

একদিন সন্ধেবেলা নিজের ঘরে বসেছিল প্রতাপ বোস, এমন সময় হঠাৎ হারান এসে হাজির।—তোর কোন পেপারটাতে সবথেকে ভয় জানি, সেটাই আমরা আগে ধরব।

প্রতাপ বোস অবাক, তার মানে? বলেছি না এবার পরীক্ষা দেব না?

হারান ওরই বইপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল। মুখ না তুলেই বলেছে, এবারই দিবি, তুই নিজেই দিবি, পনেরোটা দিন শুধু আমার কথা মত চল···

জবাবে প্রতাপ বোস কি একটা বলতে যেতে হারান ভট্টাচার্য ধমকেই উঠেছিল। ছোটখাট হাসিখুশি ছেলেটার এই গলা কখনো শোনেনি।—চুপ করে আমার কথা শোন, যা বলি শুধু সেইমত করে যা, তারপর তোর পাশ-ফেলের সব দায়িত্ব আমার।

হারান আবারও বলেছে, প্রথমেই তোকে পরীক্ষার কথা ভুলে যেতে হবে। আমি যে রুটিন করে দিচ্ছি, ঠিক সেইমত প্রত্যেক দিন পড়ে যাবি। যেদিনের যেটা পড়া সেটা হয়ে গেলে আর একটা

লাইনও এগোবার চেষ্টা করবি না। এই করে পনেরটা দিন দেখ. তার পরেও যদি মনে হয় হল না, তখন ছেড়ে দিস।

প্রতাপ বোসের আশা জেগেছে, কারণ ছাত্র হিসেবে হারানের কোনো তুলনা নেই। তবু বলেছে, কিন্তু আমি যে একটুও কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, তুই এখন বলছিস, তাই জোর পাচ্ছি। কিন্তু যেই চলে যাবি, একটা লাইনও পড়তে পারব না।

হারান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে, যদি কোনো অসুবিধে না হয় তাহলে এই তিনটে মাস আমি তোর সঙ্গে থাকতে পারি। আমার সমস্ত নোটস রেডি, তোকে আলাদা করে এখন আর কিছু লিখে তৈরি করতে হবে না, সে সময়ও নেই। তাছাড়া মুখে মুখে আমি যদি তোকে পড়াই, আমার নিজেরও রিভিশন হবে আর তোরও কনসেপসন অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

প্রতাপ বোস এরপর উঠে-পড়ে লেগেছে। সারাদিন ধরে হারান পড়িয়েছে, বুঝিয়েছে, প্রত্যেকটা জটিল বিষয় ধরে ধরে জল করে দিয়েছে, তারপর সেগুলো প্রতাপ বোস রাত্রিবেলা নিজে পড়েছে। আস্তে আস্তে কখন আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিল টেরই পায়নি। পরীক্ষা ভালই দিয়েছে। ফল বেরোতে দেখা গেছে হারান ভট্টাচার্য ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর প্রতাপ বোস সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট। সেবার ফার্স্ট ক্লাস হারান একাই পেয়েছিল।

কিন্তু হারান এতবড় ব্যাপারটার কোনো ক্রেডিট নিতে রাজি নয়। বলেছে, আমার নিজের স্বার্থেই তোর বাড়ি গিয়ে থেকেছি। পরীক্ষার আগের তিনটে মাস খাওয়া-দাওয়ার কোনো চিন্তা না থাকাটা যে কত বড় রিলিফ তা তোরা বুঝতেও পারবি না।— সেই জন্যেই প্রোপোজালটা দিয়েছিলাম।

প্রতাপ বোস একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। গরীব বলেই ও ছেলে যে ভেতরে ভেতরে কত অভিমানী। তা খুব ভাল করেই জানত।

বি. এ. পাশের পর প্রতাপ বোস ল-তে ভর্তি হয়েছে আর

হারান ভট্টাচার্য তাদের দেশের কাছে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও আর পড়লই না। তার নাকি এসব কিছু ভাল লাগছে না। মাঝে দু একবার প্রতাপ বোসদের বাগবাজারের বাড়িতে এসেছিল, তারপর দীর্ঘ দিনের ছেদ। বহুকাল পরে আবার এই যোগাযোগ।

শমিতা এতসব জানত না। রমেন চৌধুরী ছাড়াও প্রতাপ বোসের আর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে শুনেছিল, কিন্তু অত খেয়াল করেনি। সেদিন প্রতাপ বোসের কাছে শোনার পর আপসোস করেছে লোকটাকে বসিয়ে রাখে নি বলে। আর আশ্চর্য লোক বটে! বাচ্চাটাকে জল পর্যন্ত খেতে দিল না। শমিতা প্রতাপ বোসকে জিগ্যেস করেছে, তার সঙ্গের ওই বাচ্চাগুলো কারা? বিয়ে-থা করেছে নাকি? অবস্থা তো মোটেই ভাল মনে হল না।

প্রতাপ বোস জবাব দিয়েছে, হারান বিয়ে করেছে বলে মনে হয় না। যেখানেই যায় বাপ-মা মরা কতগুলো হতভাগা ঠিক ওর সঙ্গে জুটে যায়। সেই কলেজ লাইফ থেকে দেখেছি, এরাও তাই হবে।···কোন ঠিকানাপত্র রেখে যায়নি?

শমিতা মাথা নেড়েছে, না।

এর তিন চারদিন পরে হারান ভট্টাচার্য আবার এসেছে। এবার একা। এদিন প্রতাপ বোসও বাড়ি ছিল। হৈ-হৈ করে বন্ধুকে একেবারে নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে এল, শমিতার সঙ্গে আর এক দফা আলাপ করিয়ে দিল। এ দিন আর সে কাজে বেরোয়নি। সারাদিন দুই বন্ধু খাওয়া-দাওয়া গল্প-সল্প করেছে। শমিতা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই তাদের আড্ডায় যোগ দিয়েছে। হারান ভট্চায সোৎসাহে তাকেও নিজের ভবিষ্যতের প্ল্যান বুঝিয়েছে। বলেছে, তার যত চিন্তা-ভাবনা ওই সর্বহারা ছেলেগুলোকে নিয়ে। কলকাতার কাছাকাছি খুব সস্তায় জমি পেয়েছিল খানিকটা, সেখানেই চালাঘর

তুলে ওদের নিয়ে মহা আনন্দে আছে। তার ডেরার নাম দিয়েছে 'হোলি-গার্ডেন'। ছেলেগুলোকে লেখাপড়া থেকে শুরু করে সমস্ত রকম কাজকর্ম নিজে হাতে ধরে শেখায়। ওখানে একটা স্কুলে আপাতত পড়াচ্ছে, পয়সাওয়ালা দুটো বাড়িতে টিউশনও নিয়েছে। আর ছেলেগুলোর মনের শিক্ষার জন্যই ওদের নিয়ে মাঝে মাঝে চাঁদা তুলে যারা আরও গরীব, তাদের সাহায্য করে বেড়াচ্ছে। এ ভাবেই এখন চলছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এটাকে আরও বড় করে তোলার ইচ্ছে। অসহায় শিশুগুলোর যাতে একটু আশ্রয় জোটে, মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগটুকু অন্তত পায়, কখন যেন না ভাবে ওদের কেউ নেই, প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের আপনার জন হয়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টার শেষ নেই হারান ভট্টাচার্যের।

উৎসাহে দুচোখ চকচক করছিল। আপনি-তুমির ভেদ ভুলে শমিতাকে বলেছে, দেখ ম্যাডাম, দিন যত জটিল হবে এরকম শিশুর সংখ্যা তত বাড়বে। কিন্তু ওরা যদি এক চিলতে আশ্রয়ের অভাবে আর একটুখানি ভালবাসার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার অভিশাপ থেকে তোমার আমার প্রতাপের কিংবা তোমাদের কোলে যে সন্তান আসছে তার, কারোর রেহাই নেই। তোমরা আমাকে পাগল ভাব কিন্তু আমি ভাবি এই একটা মাত্র জীবনে যদি দশটা ছেলেও গড়তে পারি, সেই দশটা তো অন্তত বাঁচল।

কথাগুলো শমিতার একেবারে ভিতরে গিয়ে বসেছিল। নিজে মা হতে চলেছে তাই পরের সন্তানের জন্য এই মমতা অদ্ভুত ভাল লেগেছে। বড় বড় কথা সবাই বলে, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে সেটা করে ক'জন? আর তখনই মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা খচখচিয়ে উঠেছে সেটা না বলে পারেনি। অনুযোগের সুরে বলেছে, এত মায়া আপনার, অথচ বাচ্চাটাকে সেদিন জলটুকুও খেয়ে যেতে দিলেন না?

হারান ভট্চাযের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরাট। —ওরা যে কত কিছু জান না। গরিবের ছেলে তো, হিসেবের মাথা তাই

তোমার থেকে অনেক বেশী সাফ। লক্ষ্য করেছ, ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা জল চাইল, আর অমনি অন্যগুলো চকচকে মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল ?

শমিতা মাথা নেড়েছে, হ্যাঁ, তাতে কি ?

হারান ভট্‌চায হেসেই বলেছে, ওরা জানে ওইটুকু ছেলেকে শুধু জল তুমি কখনই দেবে না, খাবারও কিছু না কিছু আনবেই —আর একই সঙ্গে রয়েছে যখন, ওদের ভাগ্যেও কিছু জুটবে।

শমিতা, প্রতাপ বোস দুজনেই হতভম্ব। প্রতাপ বোস বলে উঠেছে, সে কথা তো তুই-ই ওকে বলে বাচ্চাগুলোকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতি।

হারান ভট্‌চাযের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল এবার। মাথা নেড়েছে, না। অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ওদের যেতে হবে। এখন থেকে লোভ কন্ট্রোল করতে না শিখলে ওদের সবচেয়ে ক্ষতি। ওদের জন্যেই আমাকে নির্মম হতে হয়, তাতে আমারও কম কষ্ট হয় না।

শমিতার দু চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছে। ওপর-ওপর নেরম এই নিপাট ভালমানুষটার মধ্যে যে ইস্পাত-কঠিন আর একটা লাক আছে, তাকে ও সেদিন দেখতে পেয়েছিল।

দিন গেছে। মেয়ে এসেছে। প্রতাপ বোস শমিতার সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম রেখেছে নন্দিতা, আদরের নাম নানু। প্রথম সন্তান, দুজনেই খুশি। কিন্তু সব থেকে খুশি বোধ হয় হারান ভট্‌চায। নানু-মায়ের জন্যই তার আসা আরও বেড়েছে। কাদার মত জ্যান্ত পুতুলটাকে নিয়ে তার সেকি আনন্দ ! ছোট্ট শিশু একটা কিছু করে আর হারান ভট্‌চায আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, দেখেছ মেয়ের কাণ্ডটা, কি করছে দেখ !

শমিতা যদি কখনো বলেছে, সব বাচ্চাই এরকম করে, হারান

ভট্‌চায ওমনি মাথা নাড়ত।—কক্ষনো না। নানু-মা আলাদা, ওর মত কেউ না।

প্রতাপ বোস আর শমিতা হাসত। হারান ভট্‌চায আরও খুশি মেয়ে হয়েছে বলে। বলত, আমার শুধু গাদা গাদা ছেলে। একটা মেয়ে না থাকলে কি ঘর ভরে? সব বুঝে-শুনেই তো আমার নানু-মা এসেছে।

শমিতা মাঝে মাঝে তার ওপর চড়াও হত, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কোনো দিন বিয়েই করবেন না?

হারান ভট্‌চায ভালমানুষের মত মাথা নাড়ত, নিশ্চয় করব। তোমার মেয়ে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, এবার একটা ছেলে হওয়ার জন্যে প্রতাপকে ম্যাক্সিমাম দুটো বছর সময় দেব, তারপর তো তুমি আমার জন্যে ফ্রি।

শমিতা কটমট করে তাকাতে গিয়েও হেসে ফেলেছে।

বড় সুখে দিন কাটছিল। মেয়ে বড় হচ্ছিল কিন্তু তার লেখা-পড়া নিয়ে প্রতাপ বোস বা শমিতা কাউকেই এতটুকু কিছু করতে হয়নি। সেসব ওর হারানকাকুর দায়িত্ব। নন্দিতা একটু বড় হতেই হারান ভট্‌চায ওকে নিয়ে তার হোলি-গার্ডেন-এ চলে যেত। নিজে পড়াত। ফলে ছোটবেলা থেকেই নন্দিতার পড়াশুনোর ভিত আশ্চর্য রকমের পাকা। এরপর স্কুলে যে অনায়াসে অত ভাল রেজাল্ট করে গেছে, তার সবটুকুই ওর হারানকাকার হাতযশ।

প্রতাপ বোসের কাজের চাপ দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। ইতিমধ্যে তার বাবা মারা যাওয়াতে সমস্ত ক্লায়েন্ট তার একলার ঘাড়ে। এক একদিন নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত সময় পেত না। আর টাকা তো যেন ছপ্পর ফুঁড়ে আসছিল। এদিকে শমিতার নিজের জগৎও থেমে ছিল না। চেষ্টাচরিত্র করে বি. এ. পরীক্ষাটা নানু পেটে থাকতেই দিয়ে দিয়েছিল। সেটাও আবার হারান ভট্‌চাযের কৃতিত্ব। লোকটা যে বাংলাতেও এত ভাল, জানত না। নিজে আগে শমিতার বইগুলো পড়ে নিয়েছে, তারপর এক একটা টপিক

ধরে ধরে মুখে মুখে ওর সঙ্গে আলোচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের তুলনা-মূলক ব্যাখ্যা শুনে শমিতা মুগ্ধ হয়ে যেত। পরীক্ষার খাতায় জায়গা বুঝে হারান ভট্‌চাযের কত কথাই না বসিয়ে দিয়েছিল। ফল বেরোতে দেখা গেছে রীতিমত উঁচু সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে।

এর সঙ্গে শমিতার লেখাও এগিয়ে চলছিল। নন্দিতা হওয়ার পর কিছুদিনের সাময়িক ছেদ, তারপর আবার শুরু করেছে। ঘরের লোকের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ পায়নি তখন। সারাদিনের খাটুনির পর প্রতাপ বোস রাতে শুয়ে শুয়ে লেখা পড়েছে, সমালোচনা করেছে, টেকনিকাল কোনো ভুল থাকলে বইপত্র ঘেঁটে ঠিক করে দিয়েছে। সপ্তাহে অন্তত তিন থেকে চারদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে। প্রথম বই দুটো ছাপার টাকা তো প্রতাপ বোস পকেট থেকে বার করে দিয়েছিল। সঙ্গে ঠাট্টাও করেছিল, এরপর না আমিই মিস্টার শমিতা বোস হয়ে যাই। অবশ্য এর পরের বইগুলো ছাপতে আর ঘরের টাকা লাগেনি, প্রকাশক আপনিই এসেছে।

কোথাও কোনো ফাঁক ছিল না। শমিতা বোসের দিন বড় সুখে কাটছিল। এর মধ্যে শাশুড়ির মৃত্যু বেদনার হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাঁর বয়েস হয়েছিল। কিন্তু বিরাট ধাক্কা হয়ে এল প্রতাপ বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন চৌধুরীর মৃত্যু।

এই একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শমিতা বোসের ভর-ভরতি সুখের সংসারে চিড় ধরেছে। তারপর ওই ছোট্ট একটু ফাঁক আস্তে আস্তে বিরাট ফাটল হয়ে উঠেছে। এখন সেই ফাটলের একদিকে দাঁড়িয়ে প্রতাপ বোস আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে শমিতা বোস নিজে।

অতীতের জাল ছিঁড়ে আজকের এই মুহূর্তটাতে ফিরে আসতে একটু সময় লাগল শমিতা বোসের। চোখের জলে টেবলের খানিকটা জায়গায় ভিজে দাগ পড়েছে। ল-ফাইনালে নন্দিতার

ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার খবরের চিরকুটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। কলমটা তুলে কাগজে আঁকিবুকি কাটল খানিকক্ষণ। শ্রান্ত লাগছে।

মিহিরের গাড়ির আওয়াজ, নানু ফিরল। শমিতা বোস উঠে ক্লান্ত পায়ে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেল।

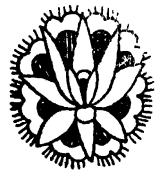

শমিতা খেতে খেতে মেয়েকে লক্ষ্য করছিল। চোখ-মুখ দিয়ে চাপা খুশি ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিছুই খাচ্ছে না, খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু। মা যে দেখছে সে খেয়ালও নেই। নিজের মধ্যেই ভরপুর। শমিতা বোস জিজ্ঞেস করল, রেজাল্টের খবর তোর বাবাকে জানিয়েছিস তো?

নন্দিতা চমকে উঠল। যা ভাবছিল তাতে আচমকা ছেদ পড়ল যেন। সামলে নিয়ে জবাব দিল, তা আর জানাইনি! বাবাকেই তো সবথেকে আগে বললাম। তুমি বাড়ি ছিলে না বলে খবরটা তোমার টেবলে লিখে রেখে গেছি।

শমিতা বোস এবার আলতো করে জিগ্যেস করল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, মিহিরের বাড়ি?

নন্দিতা থতমত যেন একটু। মায়ের শান্ত দুচোখে সারা শরীরে বিঁধে আছে। কানের কাছটা গরম ঠেকল। বলল, প্রথমে সিনেমা দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম, টিকিট পেলাম না, তাই শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়িতে বসেই গল্প করছিলাম।

মা চেয়েই আছে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। কি মনে পড়তে উত্তেজনায় মুখ লাল। বলল, দুপুরে তোমার ওই মোহন চৌধুরী এসেছিল। ওকে একটু বুঝেশুনে কথা বলতে বলে

দিও। আর কোনো দিন যদি এরকম হয় সোজা ঘাড় ধরে বার করে দেব।

শমিতা বোস অবাক। মোহন! কি হয়েছে? সে কি করেছে?

তপতপে গলায় নন্দিতা দুপুরের সমাচার বলল। সব শুনে শমিতা বোস স্তব্ধ খানিকক্ষণ! তারপর ফিরে মেয়েকেই মৃদু অনুযোগ করল, তুই-ই বা প্রথমে ওর সঙ্গে লাগতে গেলি কেন?

নন্দিতা রাগে ছিটকে উঠল, সেটাই তোমার কাছে বড় হল? আর বাবাকে যে এতবড় অপমানটা করে গেল, প্রফেশান নিয়ে কথা তুলে, মিথ্যে কথার চাষ করে বলল, আর ঘুরিয়ে জোচ্চর বলল, সেটা কিছু না?

শমিতা বোস চুপ। নন্দিতা আবার গরগর করে উঠল, আমিও ছাড়িনি। মিহিরের বাড়ি যাওয়ার আগে সোজা হারানকাকার ডেরায় তাকে সব বলেছি। হারানকাকু ওকে আমার কাছে ক্ষমা চাইয়েছে।

শমিতা বোসের ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল একটু। তারপরেই সমস্ত মুখ বিবর্ণ।—তুই হারানবাবুকে এসব কথা বলে এসেছিস?

শুধু বলে আসিনি, বাছাধনকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাইয়ে তবে ছেড়েছি। আমিও বাবার মেয়ে! নন্দিতার গলার স্বরে এবার রাগের থেকে তুষ্টি বেশি।

শমিতা বোস আধখাওয়া ডিশটা সরিয়ে উঠে পড়ল। মুখ সেমনি সাদা। আস্তে করে বলল, কাজটা ভাল করিসনি, খুব অন্যায় করেছিস।

মায়ের মুখ দেখে নন্দিতা থমকাল। কিন্তু খাবারের প্লেট সরিয়ে দেওয়াতে আবাবও রাগ হচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠল, তা বলে তোমার না খেয়ে ওঠার কি হল?

কি যে হল সেটা বুঝতে পারলে তোরও আর খাওয়া হবে না। খেয়ে নে।

রাগ করে এবার নন্দিতাও বেশ জোরেই নিজের ডিশটা ঠেলে

দিয়ে উঠে পড়ল। শমিতা বোস চুপচাপ দেখছে শুধু, একটি কথাও বলল না। তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

এর দুদিন পরে হারান ভট্‌চায এসে হাজির! নন্দিতাকে দেখে একগাল হেসে জিগ্যেস করল নানু-মায়ের রাগ পড়েছে কিনা। ও কিছু বলার আগেই শমিতা বোস বলে উঠল, কিন্তু আপনার রাগ তো এখনও পড়েনি। ছেলেটাকে তিনদিন ধরে একেবারে উপোস করিয়ে রাখলেন?

হারান ভট্‌চায তেমনি হেসেই বলল, একেবারে উপোস কোথায়? নুন দিয়ে যত ইচ্ছে জল খাচ্ছে।

নন্দিতা হতভম্ব হয়ে দুজনের কথা শুনছিল। কিছু না বুঝতে পেরে বলে উঠল, তার মানে?

শমিতা বোসের ঠাণ্ডা দুচোখ এবার মেয়ের দিকে। তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, মানেটা আমি জানতাম বলেই সেদিন বলেছিলাম নালিশ করে ভাল করিসনি। যে কোনো ব্যাপারে সংযম হারানো হারানবাবুদের ওখানে সব থেকে বড় অপরাধ, আর তার শাস্তিও সেরকমই।

নন্দিতার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছে। ওর জন্যই একটা লোক তিনদিন ধরে না খেয়ে রয়েছে! রাগই হয়ে গেল। হারানকাকার ওপর, মায়ের ওপর, আসলে সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর। তপতপে গলায় হারানকাকাকে বলল, সে ব্যাপার তো ক্ষমা চাওয়াতেই মিটে গেছল, তারপরেও এই শাস্তির দরকার হল কেন? আক্কেলটা আমাকেই দেবার জন্যে?

হারান ভট্‌চাযের হাসি মুখ।—নানু-মা, তোর হারানকাকুর গোয়ালে কেউ কাউকে শাস্তি দেয় না। দোষ করেছে বুঝলে ওরা নিজেই নিজেকে শাসন করে, কাউকে একটি কথাও বলতে হয় না। আমাকে শুধু ব্যাপারটা জানিয়ে রাখে।

নন্দিতা জোরেই বলে উঠল, তা বলে একটা ছেলে তিন দিন ধরে না খেয়ে থাকলেও তুমি কোনো কথা বলবে না?

হারান ভট্‌চায তেমনি হাসি মুখেই মাথা নাড়ল, না। ছোট-বেলা থেকেই ওদের মধ্যে আমি শুধু চরিত্র তৈরির বীজটা পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করি, বাকিটা ওরা নিজেরাই করে নিতে পারে। তখন আমারও কিছু বলতে যাওয়াটা বাড়তি হয়ে দাঁড়ায়।

নন্দিতার রাগ তো পড়লই না, উল্টে ব্যঙ্গ করে উঠল, এইসব মহামানব তৈরি করার কারখানাটা একেবারে হিমালয়ে গিয়ে বানালেই তো পারতে, আমাদের মত পাপী-তাপীদের মধ্যে কেন?

হারান ভট্‌চাযের দু'চোখে এবার অস্বাভাবিক চকচক করে উঠল। ভারী গলায় বলল, মহামানব নয়, আমি কেবল মানুষ গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি, নির্ভেজাল মানুষ। তার জন্যে এর থেকে ভাল জায়গা আর কোথায় পাব বল? যেখানে মা পেটের জ্বালায় ছেলে বিক্রি করে, বন্ধু বন্ধুর বুকে ছুরি বসায়, ঘরের বউদের ধরে ধরে পুড়িয়ে মারে, তরতাজা ছেলেগুলোকে ট্রেনের চাকার নিচে ফেলে দেওয়া হয়, আর যেখানে হাত-পা নিয়েও পঙ্গুর মত ভদ্র-লোকেরা শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখে, মানুষ গড়ার এর থেকে ভাল জমি এই দুনিয়াতে আর কোথায় পাব বলতে পারিস?

নিবিড় ব্যথা থেকে উঠে আসা কথাগুলোর ছোঁয়ায় ঘরের বাতাসও টনটনিয়ে উঠল যেন। মা-মেয়ে দুজনেই চুপ। হারান ভট্‌চাযের পরিবেশটাকে হাল্কা করার চেষ্টা এবার। নন্দিতার দিকে ফিরল, মুখে, গলার স্বরে আবার মজার আমেজ, আসলে তোর হারানকাকার গোয়ালের প্রত্যেকটা গরুরই নিজস্ব এক একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ আছে। যেমন ওই মোহন ছোঁড়াটার। ওর প্রিন্সিপ্‌ল্‌ হল সবচেয়ে আগে নিজের জিভ সংযত করা।

নন্দিতা বল, তা বলে এইভাবে তিনদিন ধরে উপোস করে থাকলেও তুমি কিছু বলবে না?

বললাম যে, কেবলমাত্র ভুল করলেই আমি ওদের কিছু বলি, শুধরানোর চেষ্টা করি। মোহনের তোকে ওরকম বলাটা ভুল হয়েছিল। তখন যা বলার বলেছি।

নন্দিতার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে। হারানকাকা যা-ই বলুক সমস্ত ব্যাপারটার জন্য যে আসলে ওই দায়ী সেটা তো ঠিক। প্রায় কবুল করার মত করেই বলল, কিন্তু আমিই যে ওকে প্রথমে খুঁচিয়েছিলাম।

হারানকাকুর হা-হা হাসি।—সে জন্যেই তো মোহনের নিজের ওপর সবথেকে বেশি রাগ! এই সামান্য প্রোভোকেশানটুকু ও জয় করতে না পেরে রিঅ্যাক্ট করে বসল।

নন্দিতা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—অপরাধটা যখন আমার কাছেই করেছে, তখন শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়ার মালিকও আমিই। চল, যা বলার আমিই বলব, ওঠো।

হারান ভট্‌চাযের ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তেমনি বসে বসেই বলল, তা না হয় উঠলাম, কিন্তু যদি কিছু করতে না পারিস তখন আবার আমাকে দুষিস না।

নন্দিতার হুকুম—ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, এখন ওঠো তো।

ওর মুখে কতকাল এই দাবির সুর শোনেনি। হারান ভট্‌চায নন্দিতার একটা হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গাড়িতে যেতে যেতে মোহনের সেদিনের সেই ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাটাই ভাবছিল নন্দিতা। এই পরিণাম হবে জানলে কে মরতে হারানকাকাকে বলতে যেত? একটা মানুষ ওরই জন্য তিনদিন ধরে শুধু নুন-জল খেয়ে আছে! তার ওপর হারানকাকু জিভ সংযত করার যে কথাটা বলল, সেটা তো ঘুরে নন্দিতার পিঠেই চাবুক হয়ে নেমেছে। সেদিনের নালিশ করার ব্যাপারটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।···বিশেষ দরকারের ছুতো দেখিয়ে মিহিরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে হারানবাবুর 'হোলি গার্ডেন'-এ হানা দিয়েছিল নন্দিতা। মিহিরকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে সোজা হারানকাকুর ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। হারানকাকা যেমন

অবাক, তেমনি খুশি। কি রে, তুই! বোস বোস! আজ কি দিন!

খুব সুদিন নয়, বসতে আসিনি। তোমার ওই মোহনকে ডাকো এখানে।

কেন? সে কি করেছে?

শুনল কি করেছে। নন্দিতা নিজে যা যা বলেছিল তাও গোপন করেনি। কিন্তু তা বলে মোহন এই কথা বলবে?

হারানকাকার এরকম থমথমে মুখ নন্দিতা আর কখনো দেখেনি। তক্ষুণি মোহনকে ডাকিয়ে এনেছে। গলার স্বর ভয় ধরানোর মত ঠাণ্ডা।—ওকে কি বলেছিস?

মোহন চুপ।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? নানু-মাকে কি বলে এসেছিস?

মোহন মুখ তুলেছে। চোখে চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট জবাব দিয়েছে, আমি আগে কিছুই বলিনি।

হারানকাকুর মৃদু-কঠিন গলা।—আগে না পরে আমি জানতে চাইনি। এতদিন ধরে কি শিখলি তবে? চোখের বদলে চোখ উপড়ে নিলে অন্ধের সংখ্যাই শুধু বাড়ে, একটা বাজে কথার উত্তরে আরেকটা বাজে কথায় শুধু তিক্ততাই বড় হয়ে ওঠে। নিজেই না বলিস মানুষের সবথেকে বড় শত্রু তার নিজের জিভ?

মোহন চুপ একেবারে।

ওর কাছে ক্ষমা চা, হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চা।

নন্দিতার দারুণ অস্বস্তি লাগছিল। বাধা দিয়েছে, না না, ওভাবে কিছু বলতে হবে না।

মোহন মুখ তুলল। এক সেকেণ্ডের জন্য চোখ জোড়া দুটুকরো জ্বলন্ত কয়লার মত ধক-ধক করে উঠল, তারপরেই শান্ত আবার। আস্তে আস্তে নন্দিতার একেবারে সামনে এসে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর দুহাত জোড় করে ওর

চোখে তাকাল। রাগ নয়, অনুযোগ নয়, খুব নরম একটু ব্যথার হাসি সেখানে চিকচিক করছিল।

অস্বস্তি ভুলে নন্দিতাও চেয়ে ছিল। চমক ভেঙেছে হারান-কাকার কথায়, ওঠ এবার, যা। ঘাড় যত নোয়াবি মেরুদণ্ড ততো শক্ত হবে, বুঝলি রে হতভাগা?

মোহন উঠে দাঁড়াল। সেই ব্যথা-মাখা হাসি-মুখে বলল, বুঝলাম। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আর তারপরে এই উপোস।

হারানকাকার ডাকে সাড়া ফিরল—কিরে নামবি না?

কখন এসে গেছে নন্দিতা খেয়ালই করেনি। ওকে ঘরে বসিয়ে হারান ভট্‌চায মোহনকে নিজেই গিয়ে ধরে নিয়ে এলো। —নানু-মা বলছে, দোষটা যখন ওর কাছেই করেছিস, তখন শাস্তি দেওয়া না-দেওয়ার মালিকও ও-ই। তোর উপোস ভাঙার জন্যে নিজে এসেছে।

মোহন নন্দিতার দিকে চেয়েও দেখল না। হারানকাকাকেই বলল, দোষ আমি নিজের কাছেই করেছি, কাজেই শাস্তি দেওয়ার মালিকও আর কেউ না।

রাগ করবে না প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও নন্দিতা তেতে উঠল। —খুব যে মহাপুরুষ হয়ে গেছ একেবারে! এই না খেয়ে থেকে আক্কেলটা দিচ্ছ কাকে?

এবার নন্দিতার দিকে সোজা তাকাল মোহন। স্পষ্ট জবাব দিল নিজেকে।

ও! ক্ষোভে ঠোঁট কামড়াল নন্দিতা। আঙুল তুলে হারান-কাকাকে দেখিয়ে বলল, এই যে লোকটা তোমাদের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর জন্যে নিজের সব কিছু ছেড়েছে, এভাবে জল খেয়ে থেকে তাকেও যে তলায় তলায় কত কষ্ট দিচ্ছ জানো না?

মোহন দাঁত বের করে হেসেই উঠল এবার। এরকম মজার কথা আর শোনেনি যেন। —কার কষ্টের কথা বললে? কাকুর?

যেমনি হাসতে হাসতেই বলে চলল, এইখানে দশ থেকে কুড়ি বছরের প্রত্যেকটা ছেলের সপ্তাহে একদিন করে প্রায় নির্জলা উপোসের দিন। আর কাকু সেদিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে হৈ-হৈ করে যেটুকু ভালমন্দ পারে জোগাড় করে খায়। যাদের উপোস তারা সেদিনের সব কাজ করে। রান্নাবান্না, পরিবেশন, এঁটো-বাসন মাজা, বিছানা করা—সব কিছু। তারপর রাত দশটার পর এক গ্লাস করে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

নন্দিতা দুচোখে তাজ্জব বিস্ময় নিয়ে হারান ভট্‌চাযের দিকে তাকাল।—সত্যি? তুমি এই নিয়ম বানিয়েছ?

সে-ও হাসতে হাসতেই ঘাড় নাড়ল। সত্যি।

মোহন আবার বলল, কাকু কোনো নিয়ম বানায় না। নিজে যা করে আমরাই নিজেদের স্বার্থে সেটাকে নিয়ম বানাই। কাকু নিজেই সপ্তাহে একদিন নির্জলা উপোস থেকে সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে করে। রান্নাবান্না করে আমাদের খাইয়ে, এঁটো কাচিয়ে, বিছানা পেতে আমাদের শুইয়ে তারপর নিজে একগ্লাস জল খেয়ে শোয়। কোনোদিন এর নড়চড় হয়নি। আমরাও সেটাই করি। যার ইচ্ছে হবে না সে করবে না। কিন্তু এখানে এমন একজনও নেই যার ইচ্ছে হয় না।

নন্দিতা অবাক। তা বলে নিজের জেদ ছাড়ল না। বলল সে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা-খুশি করো, কিন্তু আমাকে ইনভলভ্ করে এসব চলবে না। তোমাকে উপোস ভাঙতে হবে। কাকু, ওকে কিছু খেতে বল। মোহন চৌধুরীর তেমনি হাসি মুখ। হারান ভট্‌চাযকে বলল, তুমি হুকুম দিলে উপোস ভাঙতেই হবে। কিন্তু এরপর কতদিন যে না খেয়ে কাটাব তা তুমি টেরও পাবে না। কাল থেকেই খাওয়া শুরু করতাম, সেটাও বন্ধ হবে।

হারাম ভট্‌চাযই ফাঁপরে পড়ল, যেন শাস্তিটা তারই। তাড়াতাড়ি বলল, থাক থাক নানু-মা, এ নিয়ে আর কথা বাড়াস না। কাল থেকেই তো খাবে শুনলি।

আর একটাও কথা না বলে নন্দিতা বাড়ি ফিরল। বরাবরই নিজের জোরের ওপর অটুট আস্থা। সেটা এভাবে তছনছ হয়ে যেতে ক্ষোভে চোখে জল আসার দাখিল। কেন যে মরতে ওখানে গিয়ে সেধে অপমানিত হয়ে এলো! তা-ও কিনা এরকম একটা মুখ্যু, গোঁয়ারের কাছে। এটাকে অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না নন্দিতা।

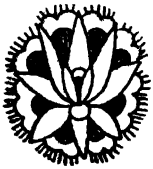

বাবার অফিসেই ঢুকল নন্দিতা। পুরনো বাড়ির এক তলার বড় হলটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করত প্রতাপ বোস। আলাদা চেম্বার। অন্য যে জনা ছয়েক জুনিয়র উকিল ছিল। নন্দিতা আপাতত তাদের সঙ্গে বসা শুরু করল। বাবাকে নন্দিতা ওর এই ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল। প্রতাপ বোস খুশি হয়েই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কোর্টে ওর নামও রেজিস্ট্রি করিয়ে রেখেছে, প্র্যাকটিস করার যাতে অসুবিধে না হয়। নন্দিতারও সেই ইচ্ছে, কিন্তু তার আগে বাবার চেম্বারে কিছুদিন কাজ শিখে নেওয়ার বাসনা। এই কর্মজীবন ওর দারুণ লাগছে। এখন সকাল দশটা থেকে পাঁচটা এ বাড়িতেই কাটে। তারপরে ও প্রায়ই কোনো কেস নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় জমে যায়, তখন আর কিছু খেয়াল থাকে না। মাকে ফোন করে জানিয়ে দেয় সেদিন আর ও ফিরছে না। দার্জিলিংয়ের হস্টেলে যাবার আগে যে ঘরটায় থাকত, এখানে থাকলে এখনো সে ঘরেই শোয়। পুরনো দিনের এক একটা ঘটনা, বাবার সঙ্গে ষড় করে মায়ের পিছনে লাগা, মা-বাবার চোখে-চোখে কথা—

সবকিছু সুতোর মত ওর মনটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। তখন একই সঙ্গে ভাললাগা আর বিষণ্ণতায় ভেতরটা ছেয়ে যায়।

বাবা যখন যত্ন করে ব্রিফ তৈরি করে বা কেস সাজায়, তখন নন্দিতা সবার অলক্ষ্যে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে। কোন নিষ্ঠার জোরে আজ এতখানি উঠেছে সেটা অনুভব করে। তখন মায়ের ওপর আরও রাগ হয়। কাজের এই নিষ্ঠাকেও সম্মান করতে পারল না? প্রতাপ বোসের চুলের দুপাশে এখন সাদার ছোপ, কপালে বয়সের রেখা। তবু যখন কাজে ডুবে থাকে তখন সেই তন্ময় পুরুষকারের রূপ আলাদা। কিন্তু আশ্চর্য, লেখিকা হয়েও মা তা দেখতে পেল না! নন্দিতা বাইরের লোকের চোখ দিয়ে বাবাকে মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করে। তখন রাগ সত্ত্বেও মায়ের জন্য এক ধরনের দুঃখও হয়।

অফিসে কাজের ছুতো ধরেই বাবার সঙ্গে মজাও বড় কম হয় না। কোনো রকম গলদ দেখলেই বাবা ওকে জব্দ করার চেষ্টা করে। নন্দিতাও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ে না। আর প্রতাপ বোসের যেন মেয়ের কাছে হেরেই আনন্দ। নিজে জব্দ হলে হা-হা করে হাসতে থাকে।

একদিন নন্দিতা সবে অফিসে এসে বসেছে, বেয়ারা ওর নাম লেখা একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে গেল। পড়ে তো ও অবাক। এক যোগ-ব্যায়াম সংস্থার মালিকের কন্সালটেশন ফি হিসেব একশো টাকার বিল। প্রথমে নন্দিতা ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করতে পারেনি। একটু পরেই মনে পড়তে রাগে চিড়বিড় করে উঠেছে। কিছুদিন আগে ছোট মাসির বাড়িতে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার যোগ ব্যায়ামের স্কুল আছে শুনে নন্দিতা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু উপদেশ চেয়েছিল। ভদ্রলোক দু'তিনটে আসন বলে দিয়েছে, কিভাবে ওগুলো করতে হবে নিজে করে দেখিয়েও দিয়েছিল। ব্যাপার ওখানেই চুকে গেছে। তারপরে কিনা এই? একশো টাকা কন্সালটেশন ফি-এর বিল?

সন্ধেবেলা অফিস ফাঁকা হতে নন্দিতা বাবার চেম্বারে ঢুকল। বিলটা বাবার সামনে ফেলল। বাবা অবাক, এটা আবার কি?

পড়ে দেখ।

পড়ল। জিগ্যেস করল, যোগ-ব্যায়ামের আখড়ায় আবার কবে গেলি? তারপর ফি দিতে ভুলে গেছিস?

কোথাও যাইওনি আর ফি দেবার প্রশ্নও ওঠেনি। যা যা ঘটেছিল খুলে বলে নন্দিতা জিগ্যেস করল, এখন কি করব?

বাবার সাফ নির্দেশ, আপাতত কিচ্ছু করবি না। চুপ করে থাক। আবার এ ধরনের তাগিদ এলে তখন দেখা যাবে।

এর ঠিক দুদিন পরে নন্দিতা বোসের নামে আবার একটা খাম এলো। খুলে অবাক হয়ে দেখে, অ্যাডভোকেট প্রতাপ বসুর ফি-এর বিল। দুদিন আগে নন্দিতা বোস তার কাছ থেকে লিগাল অ্যাডভাইস নেওয়ার দরুন একশো টাকার কন্সালটেশন ফি-এর দাবি। তলায় স্বাক্ষর, প্রতাপ বোস।

প্রথমটায় নন্দিতা হকচকিয়ে গেলেও পরে বাবার রসিকতা বুঝতে পেরে খুব হেসেছে। মজা করে তারপর নিজের চেক বইটা নিয়ে একটা বাবার নামে আর একটা যোগ-ব্যায়ামের সেই ভদ্রলোকের নামে একশো টাকা করে দুটো অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক কাটল। সঙ্গে প্রতাপ বোসের নামে অফিসিয়াল চিঠি, দুজনেরই ফি পাঠানো হল, এবার যেন যথাবিধি ব্যবস্থা করা হয়। নিচে স্বাক্ষর, নন্দিতা বোস।

রাতে কাজের শেষে প্রতাপ বোস সেই চিঠি আর চেক হাতে পেয়ে হলঘরে এসে আগে একদফা হেসে নিল। বলল, তুই এত বিচ্ছু হয়েছিস নানু-মা!

প্রফেশনের ছুতো ধরে ঠাট্টা-ইয়ার্কি বাবা-মেয়ের একটা মজার খেলা হয়ে উঠেছিল। নন্দিতা ফাঁক পেলেই বাবাকে নাকাল করার চেষ্টা করে আর প্রতাপ বোসও কুটুস-কটুস জবাব দিতে ছাড়ে না।

একদিন খুব মন দিয়ে একটা ফাইল দেখছে, নন্দিতা ঢুকে

এদিক-ওদিক ঘুর-ঘুর করতে লাগল। প্রতাপ কসু খেয়ালই করল না, তার তখন কোনোদিকে হুঁশ নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে নন্দিতা জিগ্যেস করল, ও বাবা, দেখতেই যে পাচ্ছ না। এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ ?

মুখ না তুলেই প্রতাপ বোসের জবাব, বিধবার সম্পত্তি নিয়ে একটা জটিল কেস।

নন্দিতা মুখ মুচকে বলল, ও···আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এবার প্রতাপ বোস একটু অবাক হয়ে মুখ তুলেছে, কি আগে বোঝা উচিত ছিল ?

নন্দিতা ভাল মানুষের মত জবাব দিয়েছে, এটা যে বিধবার সম্পত্তির মামলা তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।···ইফ আ রিচ্ উইডো ডাইজ, হার ল'ইয়ার আল্টিমেটলি বিকামস্ হার এয়ার।

প্রতাপ বোস এবার ফাইল বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক। বাট ইন দিস কেস দি ল'ইয়ারস ওনলি বিকামস্ দি ওনার অব এভরিথিং।

নন্দিতা হেসেই প্রতিবাদ করে উঠেছে, এটা তুমি পার্সোনাল অ্যাটাক করলে, দিস ইজ আন এথিকাল।

আচ্ছা আচ্ছা, এথিকস্ই ফলো করছি, ভল্তেয়ার বলেছিল, হি ওয়াজ নেভার রুইন্ড বাট টোয়াইস। প্রথম, যখন একটা কেস হারল, আর দ্বিতীয়, যখন সব টাকা তার লিগাল অ্যাডভাইসারের পকেটে ঢেলে আর একটা কেস জিতল···কিন্তু সেই ল'ইয়ারের শেষ পর্যন্ত কি হল জানিস ? হি ট্যু ওয়াজ রুইন্ড ফর দ্য রেস্ট অব হিজ লাইফ, হোয়েন হিজ ওনলি ডটার টুক আপ হিজ প্রফেশন।

নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠেছে, বাবা, আবারো তুমি বাজে কথা বলছ ! আমিও ভল্তেয়ারের কোটেশানটা পড়েছি, পরের কথাগুলো সেখানে মোটেই নেই, ওগুলো সব তোমার বানানো।

প্রতাপ বোস হাসছে।

নন্দিতা আবারো কি বলতে গিয়েও হঠাৎ চুপ করে গেল। হাসা সত্ত্বেও বাবাকে বড় শ্রান্ত লাগছিল।

বাবা যতই সহজ থাকার চেষ্টা করুক, মাঝে মাঝেই যে এক ধরনের হতাশা তাকে ছেঁকে ধরে তা ওর চোখ এড়ায় না। কাজ করতে করতে প্রায়ই মোটা চশমাটা খুলে টেবলের ওপর মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকে। তার চেম্বারে একমাত্র নন্দিতারই অবাধ যাতায়াত, ফলে ধরাও পড়ে ওরই কাছে। জিগ্যেস করলে বলে, ও কিছু না। কাজ করতে করতে ক্লান্ত লাগলে এভাবে খানিক বিশ্রাম নেওয়া নাকি চিরকালের অভ্যেস। কিন্তু তার ক্লান্তি যে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, তা নন্দিতা বুঝতে পারে। বরাবরই হাই ব্লাডপ্রেসার, কিন্তু শেষ কবে চেক করিয়েছে নন্দিতা জানে না। ও প্রসঙ্গ তুললেই থামিয়ে দেয়। বলে, কিচ্ছু দরকার নেই, খুব ভাল আছি।

সেদিন নন্দিতা ভেতরে ভেতরে ভালরকম নাড়াচাড়া খেল একদফা। অন্য দিনের চেয়ে এদিন অনেক আগেই প্রতাপ বসু দোতলায় উঠে গেছল। এরকম বড় একটা হয় না। নন্দিতা একটা কেস খুঁটিয়ে পড়ছিল। বাবাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে দেখে ভাবল আজ অনেকক্ষণ গল্প করবে, তারপর রাতেও এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু ওর পড়া শেষ হতে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ওপরে উঠে বাবার ঘরে ঢুকতে গিয়েও দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। বাবা শুয়ে। সামনের বেড-সাইড টেবলে একটা আধ-খাওরা হুইস্কির বোতল, দুটো সোডার বোতলের একটা পুরো খালি, অন্যটাও প্রায় খালি। আর গ্লাসের জিনিসও অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে।···প্রতাপ বোস যে মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করে নন্দিতা জানত। সেই ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে গেল।

এক আধবার শখ করে ও-ও বাবার গ্লাস থেকে চুমুক দিয়েছে। মায়ের চোখে পড়লে রাগ করত, আর বাবা হাসত। কিন্তু আজ ধাক্কা খেল বাবাকে এভাবে একলা ড্রিঙ্ক করতে দেখে। নন্দিতা খুব ভাল করেই জানে বাবা কখনও একলা এসব খেতে পারত না, কাউকে না কাউকে জুটিয়ে নিত। মা ভাজাভুজি নানা রকম খাবার করে দিত। কাউকে না পেলে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বাবা মাকেই ধরত। মায়ের এ ব্যাপারে কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না, শুধু বিচ্ছিরি গন্ধ লাগত বলে পারতে নিজে মুখে দিতে চাইত না। তবু বাবাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই কখনও-সখনও লেমনেড বা অরেঞ্জ মিশিয়ে খেত। বাবা হেসে হেসে আক্ষেপ করত, হুইস্কির জাতই চলে গেল। সবটাই মজার ব্যাপার ছিল। তারপর আবার খেল না তো অনেক দিনই খেল না।

···সেই মানুষ আজ একলা শুয়ে এভাবে ড্রিঙ্ক করছে! নন্দিতার মনে হল বাবা যেন নিঃসঙ্গতার প্রতিমূর্তি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মাথার কাছে বসল। কাঁচা-পাকা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। জানে, এটা বাবার ভারী প্রিয়।

ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। প্রতাপ বোস তেমনি চোখ বুজে থেকেই ওর হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল। নিবিড় চাপ দিল একটু, ভারী টনটনে গলায় বলল, আরও জোরে জোরে টেনে দাও তো··নন্দিতা অবাক, আজ পর্যন্ত বাবা কখনও ওকে তুমি করে বলেনি। ডাকল, বাবা, ও বাবা!

প্রতাপ বোস প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসে বড় আলোটার সুইচ টিপল। চোখ দুটো বেশ লাল, বলল, ও, তুই? আমি ঠিক খেয়াল করিনি···ভেবেছিলাম···। চুপ করে গেল। যা বোঝায় নন্দিতা তক্ষুণি বুঝতে পেরেছে। অন্যমনস্ক হয়ে বাবা ওর হাতকে মায়ের হাত বলে ভুল করেছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ল।

প্রতাপ বোসের মুখ অস্বাভাবিক লাল এখন। গম্ভীর ভাবে বলল, রাত হচ্ছে, বাড়ি যা।

আমি বাড়িতেই আছি, মাকে জানিয়ে দিচ্ছি এখন কিছুদিন থাকব।

আঃ, কেন কথা বাড়াচ্ছিস? বলছি বাড়ি যা।

বাবা এই মেজাজে কখনো ওর সঙ্গে কথা বলে না। মুখ ছেড়ে সমস্ত বুক পর্যন্ত এখন অস্বাভাবিক রকমের লাল। কপালে নাকে, ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, কি একটা চাপা যন্ত্রণায় রগের শিরাগুলো পর্যন্ত ফুলে ফুলে উঠেছে। ছুটে গিয়ে নন্দিতা ছোটমেসোকে ফোন করল। সে ডাক্তার, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। এবার নিরুপায় হয়ে মাকেই ফোন করল। ফোন ধরল হারানকাকা। মুহূর্তের জন্য নন্দিতার মাথায় রক্ত উঠল, কিন্তু তার পরেই ভাবল, বিপদের সময় তাকে পেয়ে বরং ভালই হয়েছে।

হারানকাকা সব শুনে ওকে কোনোরকম চিন্তা না করে বাবার কাছে বসে থাকতে বলে বলল, সে এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছে।

কুড়িটা মিনিট যে এরপর কিভাবে কেটেছে নন্দিতা জানে না। বাবার কষ্ট এতটুকু কমেনি তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। নন্দিতা অসহায় ভাবে এক একবার তাকে জড়িয়ে ধরেছে, সব কষ্ট কমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে যন্ত্রণা আরও বাড়ছে বুঝে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। কুড়ি মিনিটের মাথায় হারানকাকা ডাক্তার নিয়ে এলো, সঙ্গে মোহন চৌধুরী আর 'হোলি গার্ডেন'-এর আরও কয়েকটি ছেলে। মায়ের ওখানেই সবাই ছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাবার এতটা শরীর খারাপ জেনেও মা একবার এলো না পর্যন্ত। নন্দিতা আপাতত জোর করেই ডাক্তারের দিকে মন ফেরাল।

ব্লাড প্রেসার নিয়ে আর অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল, এখুনি একটা ই. সি. জি. করা দরকার। বাড়িতেই করতে হবে, কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না।

গাড়িতে শুইয়ে এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তাও নিয়ে যাওয়া চলবে না ?

বিষম চমকে নন্দিতা দরজার দিকে তাকিয়েছে, বুকের ব্যথা ভুলে প্রতাপ বোসও। দরজায় দাঁড়িয়ে শমিতা বোস। ঘরের আর কারও দিকে চোখ নেই। ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছে, জবাবের অপেক্ষায় ডাক্তারের দিকেই চেয়ে আছে। আবারও বলল, এখানে ওঁর চিকিৎসা ঠিকমত হবে না।

ডাক্তার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ?

ওঁরই আর একটা বাড়িতে, এখান থেকে গাড়িতে দশ মিনিটের পথ। এবার ভেতরে এসে বলল, গাড়িতে শুইয়ে এটুকু নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যবস্থা ওখান থেকে করা অনেক সহজ হবে।

দ্বিধা সত্ত্বেও ডাক্তার অনুমতি দিল। সে চলে যেতে গোল বাধল বাবাকে নিয়ে। কোথাও যাবে না। হারানকাকুর দিকে ফিরেও তাকাল না, মায়ের উপস্থিতিটাও নাকচ করার চেষ্টা। নন্দিতাকেই হুকুম করল, সবাইকে যার যার বাড়ি যেতে বল··· দুদিন ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে···এ নিয়ে কোনোরকম জোর করলেই বরং আমার শরীর আরও খারাপ হবে। পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথায় তাও পারছে না।

সে কথায় কোনো কান না দিয়ে পরিস্থিতি নিজের দখলে নিয়ে এল শমিতা বোস। তার নির্দেশে ইজিচেয়ারে শুইয়ে প্রতাপ বোসকে নামান হল। তারপর ঠিক সে ভাবেই আবার চেয়ারে করে মোহনরা প্রতাপ বোসকে শমিতা বোসের বাড়িতে দোতলায় তুলল।

নন্দিতা আরো অবাক হয়ে দেখল, এটুকু সময়ের মধ্যেই মা নিজের ঘরে গিয়ে ডবল বেডের খাটটাকে দুদিকে ভাগ করেছে, একটাতে বাবার শোওয়ার ব্যবস্থা আর একটাতে তার নিজের— নন্দিতা এতটা ভাবেনি। ভেবেছিল বাবাকে একলা রাখা চলবে

না বলে ওর ঘরেই বাবার থাকার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু মা খুব সহজভাবেই বাবার সঙ্গে একই ঘরে রয়ে গেল।

নন্দিতা এরপর চেয়ে চেয়ে মোহন চৌধুরীর তৎপরতা দেখছিল। যেন ওরই বাড়িঘর। ততক্ষণে ছোটমেসো এসে গেছে। ছোটমেসো রুগীর ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলতে যেতেই মোহন চৌধুরী হেসে জবাব দিল, একটু সবুর করুন কাকাবাবু, এই ঘরটাকেই কেমন নার্সিং হোম বানিয়ে ফেলি দেখুন না!

ই. সি. জি. রিপোর্টে দেখা গেল খুব মাইল্ড অ্যাটাক, ডাক্তারের নির্দেশ অন্তত তিন সপ্তাহ পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে হবে। এসব ব্যাপারে মোহনের ব্যবস্থাপনা সত্যিই দেখার মত। কিন্তু নন্দিতার বিরক্তি বাড়তেই থাকল। সেই হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ার পর থেকে মোহন যেন ওকে চেনেই না। মা আবার বেশি আহ্লাদ দেখিয়ে এ বাড়িতেই দিনকতক থেকে যেতে বলেছিল। কিন্তু শ্রীমান হাসি মুখেই সে প্রস্তাব নাকচ করেছে, বলেছে, দরকার হলে তো নিশ্চয় থাকতাম, কিন্তু এখন সেরকম প্রয়োজন নেই, কাকাবাবু তো ভালর দিকেই যাচ্ছেন।

মায়ের সঙ্গে বাবা পারতে কথা বলে না। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ কিংবা না। কিন্তু মায়েরও যেন এখন চামড়া মোটা, অবজ্ঞা গায়েই মাখে না। রাতে তো বটেই, সারাদিনও বই বা সেলাই-ফোঁড়াই কিছু একটা নিয়ে এ ঘরেই বসে থাকে। লেখাটেখা এখন সব বন্ধ! নন্দিতা বুঝে উঠতে পারে না কি নিয়ে এদের গণ্ডগোল। ছোট মাসিকেও অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু সেও আসল ব্যাপার জানে ন।

সেদিন মিহিরের সঙ্গে নন্দিতার এসব কথাই হচ্ছিল। মিহির অনেক ভেবেও কোনো কিনারা না পেয়ে শেষে বলল, মোহনের সঙ্গে কথা বলে দেখব? ও মনে হয় কিছু জানলেও জানতে পারে।

নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, কক্ষণো না। নিজের মেয়ে হয়ে

আমি যা জানি না, তা জানবে একটা বাইরের ছেলে? অতটা ভীমরতি আমার মায়ের এখনো হয়নি।

মিহিরের মুখে এবার অন্যরকম হাসি। মোহনের ওপর তোমার এত রাগের একটা কারণ কিন্তু ও নিজেই বের করেছে। এখন আমারও মনে হচ্ছে, সেটাই ঠিক। নয়তো একটা উপকারী মানুষের ওপর খামোখা এত রাগ কারুর থাকতে পারে?

নন্দিতা সত্যিই রেগে গেল, কি, কি বলেছে ও?

মিহিরের গোবেচারা মুখ, এই তোমাকে নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল, এক্কেবারে ছেলেমানুষ ভাবে তোমাকে।

কি কথা হচ্ছিল?

মিহির হাসি চাপার চেষ্টা করছে, একদিন দুপুরে তুমি খুব সেজেগুজে বাইরের ঘরে বসেছিলে আর কলিংবেলের আওয়াজে আমি এসেছি ভেবে দরজা খুলে দেখলে মোহন!

কথাটা কোন দিকে গড়াবে আঁচ করতে পেরে ভেতরে ভেতরে নন্দিতার রাগ বাড়ছে। হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। কি রকম অভ্যর্থনা করে দরজা খুলেছিলে সে তো তুমিই জানো। মোহন বেচারা সেটা বুঝে ফেলাতেই নাকি ওর ওপর তোমার এত রাগ।···একটু থেমে মিহির আবার বলল, রসিক আছে ছেলেটা! বলে, প্রথমে ভেবেছিল ও-ই বোধ হয় হিরো, আর তার পরেই নাকি তোমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে আসল হিরোর আগে এসে পড়ে কি অন্যায়টাই না করেছে···

সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল নন্দিতার। পুরো ব্যাপারটাই বর্ণে বর্ণে সত্যি। কিন্তু তা বলে এ নিয়ে মিহিরের সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি করেছে! এবার আর শুধু হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ানো নয়, চুলের মুঠি ধরে ওই মুখটাই মাটিতে থ্যাঁতলাতে ইচ্ছে করছে নন্দিতার। মিহিরের দিকে তাকাল। পারলে ওকেই ভস্ম করে এখন। ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল, তোমাদের গল্পের আর কোনো

বিষয় নেই ? একটা রাস্তার ছেলের সঙ্গে আমাকে নিয়ে এভাবে ছ্যাবলামি করতে লজ্জা করে না তোমার ?

এবার মিহিরও চটেছে। —তোমার সেন্স অব হিউমার এত কম জানতাম না। তাছাড়া মোহন রাস্তার ছেলে নয়। তুমি যখন তখন ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার কর বলে ব্যাপারটা লাইট করার জন্যে আমিই তোমার কথা তুলেছিলাম। আমার এমব্যারাসমেন্ট কাটানোর জন্যেই ও ওই ঠাট্টাটা করেছিল।

ঠাট্টা ! আসুক এবার, ঠাট্টা বার করছি !

সঙ্গে সঙ্গে মিহিরও তপ্ত, তুমি সবেতে এত মেজাজ দেখাও কেন ? আমার সঙ্গে মোহনের যে কথাই হোক না কেন দ্যাট ওয়াজ স্ট্রিক্টলি বিট্যুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ ম্যান, এ নিয়ে তুমি ওকে একটি কথাও বললে তার ফল ভাল হবে না।

রাগে নন্দিতা চেঁচিয়েই উঠল, একশোবার বলব, তুমি চোখ গরম করছ কাকে ?

তোমাকে। আগে বাড়িতে বসে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে ক্ষোভে নন্দিতা চুপ। পুরো ব্যাপারটার জন্য মোহনকেই দায়ী করল আর মনে মনে ওর ওপর আরও খাপ্পা হয়ে উঠল।

এরপর দিনকতক নন্দিতা মিহিরের সঙ্গে নিজে থেকে কোনো রকম কথাবার্তা বলেনি। মিহির যে নিয়মিত এসে বাবার খোঁজ-খবর নেয়, মা হারানকাকু মোহন ছোট মাসি মেসো এদের সঙ্গে গল্প করে, নন্দিতা নিজের ঘরে বসে টের পায় কিন্তু ইচ্ছে করেই সামনে আসে না। মিহিরও ওকে ডাকে না, বা ফোনও করে না। এই নির্লিপ্ত আচরণে ওর প্রতি নন্দিতার আকর্ষণ আরও বাড়ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করার আর নিজেও ক্ষতবিক্ষত হওয়ার একটা দুর্বার বাসনা জোর করেই চাপা দেয় আজকাল। ফলে নন্দিতার আচরণ দিনে দিনে আরও অসহিষ্ণু, আরও রুক্ষ।

অসুস্থ প্রতাপ বোস পর্যন্ত লক্ষ্য করে সেদিন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, তোর মুখ চোখ এমন টান ধরা কেন ? কি হয়েছে ?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে, কিছু হয়নি।

প্রতাপ বোস আবারও জিজ্ঞেস করল, মিহিরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিসনি তো ?

নন্দিতা হাসতে চেষ্টা করল একটু, তা না হয় করেইছি, তা বলে বাইরের লোকের সামনে তুমি এসব কথা বলবে ?

প্রতাপ বসু অপ্রস্তুত। মোহন চৌধুরী ওঘরেই ছিল। চেয়ে চেয়ে নন্দিতাকেই দেখল খানিক, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়ার পর নন্দিতা একটা বই নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুলো। এক বর্ণও পড়ছে না। থেকে থেকে মিহিরের মুখ, পুরু দুই ঠোঁট, শক্ত শক্ত আঙুল আর লোমশ বুকের এক একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সেদিনের রাগে গনগনে চেহারাটা মনে পড়ল। ছ ফুট লম্বা শরীরটা চাবুকের মত টানটান হয়ে উঠেছিল, চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে বসেছিল, পাকা গমের মত গায়ের রং আর ঘোর বাদামী চোখ রাগের ছটায় লালচে দেখাচ্ছিল। এত সুন্দর আর এত পুরুষালি ওকে আর কখনো দেখায়নি।···নিজের অজান্তেই নন্দিতার সারা শরীর তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না, কোন এক ষষ্ঠ চেতনার অনুভূতিতে দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই নন্দিতার হৃৎপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল। মিহির খুব আস্তে করে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে। নন্দিতা চেয়ে আছে। বুকের ভেতরে এত জোরে ধক্ ধক্ করছে যে ভয়, মিহির না সেটা শুনতে পায়।

মিহির কাছে এসে শক্ত দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর ওর তপ্ত দুই ঠোঁটের ওপর নিজের মুখ রাখল। নন্দিতা জোর করে নিজের ঠোঁট টিপে রইল, মাথা নাড়ল।

মিহির অস্ফুটে হেসে উঠল, না ?

নন্দিতা আবারও মাথা নাড়ল না। অর্থাৎ, না।

মিহির হাসছে। শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিলে ? তোমার সারা গা এত গরম যে ছ্যাঁকা লাগছে।

নন্দিতা ঝাঁঝ দেখিয়ে জবাব দিল, ছ্যাঁকা লাগছে তো সরে যাও ! কে তোমাকে আসতে বলেছে···

মিহির হাসছেই, আরও ঘন হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। আদরে আদরে ওকে পাগল করে তুলতে লাগল।

তারপর কতক্ষণ কেটেছে জানে না, নন্দিতার এ ক'দিনের জমাট-বাঁধা সব ভার যেন গলে গলে বেরিয়ে গেল।

জামাকাপড় ঠিক করে আস্তে দরজাটা খুলে নন্দিতা আগে বেরোল। মিহিরকে বলল একটু পরে আসতে। ভয় নয়, চক্ষু-লজ্জা বলেও কথা আছে। বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে মা আর মোহন বসে। পরের জনকে দেখে ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ পড় পড় হয়েও পড়ল না। আসলে ভেতরটাই এখন খুশিতে ভরা। বাবার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে নন্দিতা আদুরে গলায় বলল, এবার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ বাবা—কতদিন এক সঙ্গে কাজ করি না. অফিস যাই না···

কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত যে মেয়ের টানধরা রুক্ষ চেহারা দেখেছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তার এই পরিবর্তন দেখে প্রতাপ বোস মনে মনে অবাক। কিন্তু তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ, যা আঁচ করেছে তা মুখে ভাঙল না। বলল, কেন অফিস যাস না ? একটু-আধটু গিয়ে বসলেও তো পারিস, আমি তো এখন ভালই আছি। নন্দিতার আহ্লাদী গলা, তুমি না থাকলে আমার অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না, কিছু ভাল লাগে না।

হাসি চেপে প্রতাপ বোস এবার আসল প্রশ্নটা করল, হ্যাঁ রে, মিহির আসেনি ?

ও কিছু জবাব দেবার আগেই ওদিক থেকে মোহন ফট করে

বলে বসল, অনেকক্ষণ এসেছে। তারপর নিচু গলায় আলতো করে আবারও বলল, এখন ড্রইং রুমে বসে আছে।

নন্দিতা ঘুরে তাকাল। ড্যাবডেবে দুই চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে, মুখে সবজান্তা হাসি। কান-মুখ গরম হয়ে উঠেছে নন্দিতার। মিহির কখন এসেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল সবই জানে তাহলে! নইলে শুধু ড্রইং রুমে বসে আছে বলত, সঙ্গে 'এখন' কথাটা জুড়ত না। নন্দিতা মনে মনে চিড়বিড় করে উঠল। এক নম্বরের মিটমিটে শয়তান একটা। মিহির আবার ওর পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করে! জ্বলন্ত দুচোখের ঝাপটা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে নিচে নেমে এল। মিহিরকে মোহনের শয়তানির কথা বলার পরেও ওর মুখে হাসি দেখে নন্দিতার গা জ্বলে গেল। জিগ্যেস করল, ব্যাপারটা কি বল তো? ও তোমাদের সক্কলকে এভাবে বশ করল কি করে?

মিহির হাসছে, বশ করার কথা নয়, আজকের এই হ্যাপি-রি-ইউনিয়নের জন্যে আমাদের দুজনেরই ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নন্দিতা অবাক, তার মানে?

মিহিরের ধরা-পড়া গোছের মুখ। —দেখ, এ কদিন ধরে দুজনেই কষ্ট পাচ্ছিলাম অথচ যে যার জেদ ধরে বসেছিলাম। মাঝখান থেকে মোহন আজ যেচে ফোন করল বলেই তো বরফ গলল।

এতক্ষণের ভাল লাগার ঘোর ফিকে হয়ে আসছে। নন্দিতা ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, ও তোমাকে কখন ফোন করেছে? আর কি বলেছে?

—সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার অফিসে ফোন করেছিল। তখন তুমি তোমার বাবার ঘরেই ছিলে। ও বলল, মাথা গরম একটা বাচ্চা মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেওয়াটা কি কোনো পুরুষের কাজ? তাছাড়া এ কদিন ধরে তোমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তোমার বাবা পর্যন্ত উতলা। আর সেটা তাঁর হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। কি মনে পড়তে মিহির জোরেই হেসে উঠল, ছেলেটা জিনিয়াস। আরও

কি বলেছে জান? আমি যেন দুপুরে আসি। কারণ সকাল-বিকেল তোমাদের বাড়িতে রুগী দেখতে আজকাল বড্ড ভিড় হয়।

ওর ভাল লাগার রেশটুকু নন্দিতা নষ্ট করতে চাইল না। কিন্তু ভেতরটা মোহনের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে। মাকে তো সেই কবেই হাত করেছে, মিহিরকেও ভালই পটিয়েছে এখন! কিন্তু এতবড় সাহস যে সরাসরি ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায়! কতদূর স্পর্ধা যে বলেছে, ও একটা হেডস্ট্রং ইমম্যাচিওরড মেয়ে···কিন্তু সব থেকে অসহ্য মিহিরকে দুপুরে আসার জন্য নেমন্তন্ন করাটা। মোহন চৌধুরী সত্যিই সীমা ছাড়িয়েছে এবার।

রাগে নন্দিতার ভেতরটা যত উথাল-পাতাল করতে লাগল, বাইরে তত স্থির। জোর করেই মিহিরের সামনে বসে এটা-ওটা গল্প করল, একটু আধটু খুনসুটিও করল। তারপর ক্লান্তিতে যেন আর চোখ মেলতেই পারছে না এমন ভাব করে সোফায় এলিয়ে পড়ল।

স্বভাবতই মিহির জিগ্যেস করেছে, কি হয়েছে?

নন্দিতার মুখে হাসি টানার চেষ্টা, কি আবার হবে···দুপুরে একটু রেস্ট না পেয়ে ক্লান্ত লাগছে।

মিহিরও হাসল। উঠে কাছে এসে আলতো করে ওর কপালে চোখে গালে ঠোঁটে গোটাকতক চুমু খেয়ে বলল, তুমি তাহলে এখন রেস্ট নাও, আমি বরং তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যাই, কাল সকালে ফোন করব।

নন্দিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে মিহিরের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

মিহির ঘর থেকে বেরুনো মাত্র লাইট নিভিয়ে সোফার ওপরেই পড়ে থাকল। একলা ঘরে ভিতরের ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। মায়ের আশকারার ফলেই মোহন চৌধুরী এতখানি বেড়ে উঠেছে।

আজকাল বিকেলের দিকে প্রতাপ বোসকে বারান্দায় পায়চারি করতে বলেছে ডাক্তার। আধ ঘন্টা করে রোজই টানা বারান্দার

এমাথা থেকে ওমাথা হাঁটত। সেদিন অর্ধেকটা আসার পর আর বাকি অর্ধেকটা কিছুতেই পৌঁছতে পারল না। হঠাৎ বুকে অসহ্য ব্যথা। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, ঘামে সর্বাঙ্গ জবজবে, বুক চেপে ধরে বারান্দাতেই এলিয়ে পড়ল। নন্দিতা তখন নিজের ঘরে, মা বিকেলের গা ধোওয়া সারছে, কেউ কিছু টের পায়নি। হঠাৎ কাজের লোকটার চিৎকারে নন্দিতা পড়িমরি করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নিজেও বসে পড়ল। ঠিক তখনই একগাদা ফল-মূল শাক-সবজি হাতে মোহন দোতলায় উঠে এসেছে। তাদের বাগান থেকে প্রায়ই এসব নিয়ে আসে। কাজের লোকটার চিৎকারে সে-ও প্রথমে হকচকিয়ে গেছে। পরক্ষণেই হাতের জিনিসগুলো মাটিতে ফেলে দৌড়ে এসে প্রথমেই প্রতাপ বোসের একটা হাত তুলে পালস দেখল, ছুটে ঘর থেকে একটা ট্যাবলেট নিয়ে এসে জিভের তলায় গুঁজে দিল, তারপর তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল!

নন্দিতাও এবার উঠে বাবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আর তারপরেই যা দেখল, তাতে মাথায় রক্ত উঠল। ছোটমেসোর রেখে যাওয়া ওষুধের বাক্স থেকে মোহন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর কি একটা ওষুধ বের করেছে, এক সেকেণ্ডের দ্বিধা একটু, তারপরেই ওষুধ টেনে নিয়ে চোখের পলকে বাবার বাঁ হাতে ফুটিয়ে দিল। তারপর আবারও একটা ইঞ্জেকশন ভরতে লাগল। লোকটা কি পাগল? ডাক্তার না ডেকে অজ্ঞান হার্টের রুগীকে একটার পর একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছে! নন্দিতা উন্মাদের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে মোহনের হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নিয়ে গেল। অল্পের জন্য সেটা মাটিতে পড়ল না।

মোহন এই আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে নিজেও প্রায় পড়তে পড়তে সামলে নিল। তারপর নন্দিতা কিছু বুঝতে পারার আগেই বিষম এক ধাক্কায় ওকে ও ধারের খাটের ওপর আছড়ে ফেলল। মাথাটা দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে যেতে সারা শরীর

ঝিমঝিম করে চোখে অন্ধকার দেখল নন্দিতা। একটু সুস্থির হতে দেখে মোহনের দ্বিতীয় ইঞ্জেকশনও দেওয়া শেষ। পাশের ঘরে এবার ডাক্তারকে ফোন করতে যাচ্ছে, হাতে ফোন-নম্বর লেখা চটি বইটা। বাবা একইভাবে পড়ে আছে, মা তখনও বাথরুমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল। অথচ নন্দিতার মনে হচ্ছে কত যুগ! মাথাটাও ঠিক মত কাজ করছে না। কপাল টনটন করে উঠতে হাত দিয়ে দেখল খানিকটা জায়গা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে। অব্যক্ত ক্রোধে নন্দিতার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

ফোনে কথা সেরে মোহন ঘরে ঢুকে প্রতাপ বোসের বিছানার দিকে এগোতেই নন্দিতা উন্মাদের মত তার দিকে ছুটে এলো। অসুস্থ বাবার কথা ভুলে মোহনের জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে ঝাঁকাতে লাগল।—এত বড় সাহস? গায়ে হাত তোল তুমি? তোমাকে আমি দেখে নেব। তারপরেই অজ্ঞান বাবার দিকে চোখ পড়তে গলার স্বর নামিয়ে হিসহিস করে বলে উঠল, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকারের, বাবার যদি এতটুকু ক্ষতি হয় তোমাকে আমি পুলিশে দেব। ঝাঁকানির চোটে জামার খানিকটা নন্দিতার হাতে ছিঁড়ে এলো।

মোহন একটু চুপ করে চেয়ে থেকে আস্তে করে বলল, সব থেকে আগে তোমার মাথার চিকিৎসা করানো দরকার। তারপরেই গলার ভেতর থেকে চাপা হুংকার বেরল যেন, রুগীর ঘরে ফের এরকম গোলমাল করলে তোমাকে আমি এখানে ঢুকতে দেব না। ডাক্তার এসে আগে কাকাবাবুকে দেখে যাক, তারপর যা করার কোরো। তখন হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া ছেড়ে দরকার হলে মাটিতে নাক-খতও দেব।

শমিতা বোস ঘরে এসে হতভম্ব। কি হয়েছে? একটু জোরেই আবারো চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে? মোহন? নানু? তোদের এই চেহারা কেন? উনি এভাবে পড়ে আছেন কেন?

মোহন ধরে তাকে চেয়ারে বসাল। আমাদের কিচ্ছু হয়নি

কাকিমা। কাকাবাবু হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমি দুটো ইঞ্জেকশন পুশ করে দিয়েছি। আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে দেখে নন্দিতা একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। এক্ষুণি ডাক্তার আসছে, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন তো!

মোহন যাই বলুক না কেন, শমিতা বোস এক নজরেই বুঝেছে ব্যাপার অত সহজ নয়। কিন্তু স্বামীর অসুস্থতার জন্যই আপাতত এ নিয়ে কিছু ভাবতে চাইল না। ভালই জানে মোহন দুম করে কিছু করার ছেলে নয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা শুনে বরং স্বস্তি বোধ করল কিছুটা। 'হোলি গার্ডেন'-এ রাতবিরেতে কারুর কিছু হলে মোহনই ইঞ্জেকশন দেয়। ডাক্তার কম্পাউণ্ডার না পাওয়া গেলে আশেপাশের লোকেরাও ওকেই ডাকে। নন্দিতা না জানলেও শমিতা বোস জানে ইঞ্জেকশন দেওয়াটা ওর কাছে জলভাত ব্যাপার। এখন প্রশ্ন, ঠিক ওষুধ দিয়েছে কি না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে যে কিছু করবে না সে আস্থা আছে।

হার্টের নামকরা ডাক্তার আর ই. সি. জি. মেশিন নিয়ে ছোটমেসো এল। মোহন নিপুণ তৎপরতায় যা যা দরকার হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। কি কি ওষুধ চলছিল গড়গড় করে বলে গেল। এখন নিজের দায়িত্বে পেথিডিন আর ডেরিফাইলিন ইঞ্জেকশন দিয়েছে তাও বলল। বড় ডাক্তার কিছু না বলে ই. সি. জি. নেওয়া শুরু করল। নন্দিতা শুধুই দেখে যাচ্ছে। ওকে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করল না। রিপোর্টে দেখা গেল আর একটা অ্যাটাক হয়েছে। বড় ডাক্তার এতক্ষণে বলল, ইঞ্জেকশন দুটো না পড়লে ব্যাপার রীতিমত ঘোরাল হতে পারত। এখনও কি হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু চেষ্টা করার সময়টুকু তো অন্তত পাওয়া গেছে।

ছোট মেসো আর হার্ট স্পেশালিস্ট দুজনেই মোহনকে প্রশংসা করেছে, ও দুটো ওষুধ নাকি এসব ক্ষেত্রে লাইফ-সেভার।

মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু নন্দিতরে গালে যেন দুটো চড় পড়ল। একটু আশা ছিল ডাক্তাররা এই আনাড়ি লোকের হুটহাট ইঞ্জেকশন দেওয়া পছন্দ করবে না। কিন্তু তার বদলে কিনা এই! বাবা যে প্রাণে বেঁচেছে এতে নন্দিতার থেকে বেশি খুশি আর কে? তবু এর জন্য মোহনের ওপর বিতৃষ্ণা তো কমলই না, উল্টে মনে মনে বলল, মোহন চৌধুরীর ভাগ্য ভাল যে ইঞ্জেকশনের ফলে বাবার খারাপ কিছু হয়নি। এতটুকু এদিক-ওদিক হলে ওর শেষ দেখে নিতাম।

আপাতত কোনোরকম নাড়াচাড়া না করে বাড়িতেই চিকিৎসার বিশাল আয়োজন শুরু হল। সব রকম নির্দেশ দিয়ে বড় ডাক্তার চলে যেতে মোহন বেরিয়ে ওষুধ আর অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে এল। নিপুণ হাতে প্রতাপ বোসের নাকে নল লাগিয়ে দিল। ছোট মেসো কি একটা প্রশংসার কথা বলতে গিয়ে ওর কাছে প্রায় ধমকই খেল, এখন এসব কথা রাখুন তো, আমাদের ওখানে ছোটবেলা থেকেই এগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। হারানকাকুর দৌলতে 'হোলি-গার্ডেন'-এর একটা বাচ্চা ছেলেও এসব জানে, এতে বাহাদুরির কিছু নেই। তারপর খুব আলগা করে বলল, তবে শেষ পর্যন্ত যে আমার জেলে যেতে হল না, এটাই বাঁচোয়া!

শেষের এই কথাটা ঘরের আর কেউ না বুঝলেও যে বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে। জ্বলন্ত দুচোখের ঝাপটায় ওই মুখ বেশ ভাল করে পুড়িয়ে নন্দিতা দাঁড়াল। তারপর একটা একটা করে কেটে কেটে বলল, বাবার কিছু হলে শুধু জেল নয়, ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম।···নিজের কপালের ফোলা জায়গাটাতে হাত দিল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শমিতা বোস স্থির, ছোট মেসো অস্বস্তি বোধ করছে, একমাত্র মোহন চৌধুরীই নির্বিকার। প্রতাপ বোসের নাকে অক্সিজেন ঠিক মত যাচ্ছে কি না পরীক্ষা করল, প্রেসক্রিপশন অনুসারে সকাল-দুপুর-রাতের ওষুধ আলাদা করে গুছিয়ে রাখল,

তারপর শমিতা বোসকে বলল, এখন কদিন এখানেই থাকব, আপনি একলা সব দিক সামলাতে পারবেন না। ছোট মেসোর দিকে তাকাল, আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি থাকুন। হারান কাকুকে খবরটা দিয়ে দুএকটা জামাকাপড় নিয়েই আমি চলে আসছি।

এরপর নন্দিতা চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু মোহন চৌধুরীই নয়, 'হোলি-গার্ডেন'-এর প্রায় সব বড় ছেলে কটাই পালা করে এ বাড়িতে থেকে বাবার সেবা করেছে। ওকে বা মাকে একটা দিনও রাত জাগতে দেয়নি।

সকলের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতাপ বোসের অবস্থা আস্তে আস্তে ভালর দিকে গড়াচ্ছে, এমন সময় মোহন চৌধুরী হঠাৎ বেপাত্তা। কোথাও তার খোঁজ মিলছে না।

একদিন সকালে বাড়িতে পুলিশ দেখে নন্দিতা হাঁ। পুলিশ অফিসার মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। খুব ভদ্র ভাবেই মোহন চৌধুরী সম্পর্কে খবরা-খবর নিচ্ছিল, ও কোনোদিন রাজনীতি করেছে কিংবা বিশেষ কোনো দলের ওপর দুর্বলতা আছে কিনা নন্দিতা মাকে সব প্রশ্নের একটাই জবাব দিতে শুনল, 'না'। মোহন চৌধুরীকে সে ছোটবেলা থেকে জানে। কোনোদিনই কোনোরকম রাজনীতির সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। পুলিশ অফিসার এবার খুব নরম করেই জানতে চেয়েছে মোহন এখন কোথায়, কারণ এই কথাগুলো ওর নিজের মুখ থেকে শুনতে পেলেই সব থেকে ভাল হত।

মাকে আবারও ঠান্ডা জবাব দিতে শুনল, জানে না।

পুলিশ অফিসারের চোখ ধারাল হয়ে উঠল,—হঠাৎ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এভাবে উবে যাওয়াটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে না?

মা স্পষ্ট উত্তর দিল—না। ও বরাবরই ভবঘুরে গোছের। একটা ঝোলা সম্বল করে যখন-তখন পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে

কোথাও চলে যাওয়া ওর বরাবরের অভ্যেস। বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসে। আগে চিন্তা হত, কিন্তু এখন আর এ নিয়ে ভাবি না।

মোহন চৌধুরী শেষ কবে এখানে এসেছিল?

এসেছিল নয়, ইদানীং ও এখানেই থাকত। দিন পনের হল চলে গেছে।

নন্দিতা হাঁ। মা সত্যি কথা বলছে না।

অফিসারের গলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ, কিন্তু আমাদের খবর, মোহন চৌধুরী পাঁচদিন আগেও এখানে ছিল।

নন্দিতাকে অবাক করে মা হাসল। সেটা তাহলে ভুল খবর। আমার বাড়িতে কে কতদিন আছে না আছে সেটা আমারই সব থেকে ভাল জানার কথা। তারপর একটু থেমে খুব নরম করেই জিজ্ঞেস করল, তাহলে পাঁচ দিন আগেই এলেন না কেন? তারপরেই সকলকে চমকে দিয়ে গলার স্বর কঠিন করে বলল, আপনি এত খবরই রাখেন যখন, আমার পেশার খবরটাও নিশ্চয় রাখেন। নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আমার স্বামীও খুব অসুস্থ, তবু আপনাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। এরপরেও যদি এই ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করেন, তাহলে আপনদের ডি. সি প্রকাশ রায়কে জানাতে বাধ্য হব।

নন্দিতা জানে ডি. সি প্রকাশ রায় মায়ের লেখার দারুণ ভক্ত! ভদ্রলোককে এ বাড়িতে কয়েকবার আসতেও দেখেছে। মা মুখে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও মনে মনে যে বিশেষ পাত্তা দিত না, নন্দিতা বুঝত।

এতক্ষণে যা হয়নি প্রকাশ রায়ের নামে সেই কাজ হল। কার সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ অফিসারের খেয়াল হল যেন। মায়ের এতটা দামী সময় নিয়েছে বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে জানাল, আসলে তারা সন্দীপ সেন নামে একটা ছেলেকে খুঁজছে। ছেলেটা খুনের দাগী আসামী। বেগতিক

দেখে নকশাল সেজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মোহন চৌধুরীকে ওই ছেলের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা গেছে। সে তো কত লোকের সঙ্গেই এমনি চেনাশুনা থাকতে পারে। অবশ্য একটা উড়ো খবর, মোহনই নাকি ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখেছে। যাক্‌গে, সে তো কত লোকে কত কথাই বলে! কিন্তু শমিতা বোসের মত মহিলা যখন এতবড় সার্টিফিকেট দিলেন, তখন তো সন্দেহের আর কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবু এ ধরনের কথা যখন উঠেছে তখন মোহন চৌধুরী ফিরলেই যেন একবার থানায় গিয়ে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আসে।

মা মাথা নেড়েছে, নিশ্চয় যাবে।

সন্দীপ সেন সম্বন্ধে পুলিশ অফিসার যে ডাহা মিথ্যে কথা বলল, সেটা সবাই বুঝেছে। মোহন চৌধুরী কখনোই একটা দাগী আসামীকে শেল্টার দেবে না। নন্দিতাও সেটা খুব ভাল করেই জানে। তবু জেদ করেই পুলিশের লোকটার কথা বিশ্বাস করতে চাইল, কিন্তু পারল না বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে।

নন্দিতা লক্ষ্য করেছে, পুলিশ অফিসার যাওয়া মাত্র মায়ের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে এঁটে বসল। যে ক'টা ছেলে বাড়িতে আছে তাদের বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে মোহন সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করল, 'হোলি-গার্ডেন'-এর অন্য ছেলেদেরও জানিয়ে রাখতে বলল। পুলিশ কাউকে কিছু জিগ্যেস করলে সবাই যেন মোহনের হঠাৎ করে মাঝে মাঝে বাইরে চলে যাওয়ার কথাটাই শুধু বলে। যেন বলে পনেরো দিন আগেও সক্কলে ওকে এ বাড়িতেই দেখেছে, তারপর আর কেউ কিচ্ছু জানে না।

নন্দিতা দেখল মা ওপরে এসে ডি. সি প্রকাশ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে হেসে হেসে কথা বলছে। ছেলেমেয়ের পড়াশুনা কি রকম হচ্ছে, মিসেসের শরীর কেমন, এইসব। শেষে মায়ের আসল কথা, তার লেটেস্ট উপন্যাসের হিরো এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। অতএব সত্যিকারের একজন বড় পুলিশ অফিসারের

সাহায্য না পেলে লেখাটাতে অনেক ভুল থেকে যাবে। তাই খুব শীগগীরই এক সন্ধ্যায় প্রকাশ রায়কে কষ্ট করে এখানে আসতে হবে। অবশ্য এমনি খাটাবে না, স্কচ হুইস্কি আর সেই সঙ্গে নিজের হাতে কষা মাংস আর কাবাব রান্না করে রাখবে।

ফোনের ওধারে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া নন্দিতা ভালই আঁচ করতে পারছে। আহাম্মক ব্যাটা, নামী লেখিকার এই চাটুকারিতায় নিশ্চয় ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

কিন্তু মা যে এত স্মার্ট নন্দিতার জানা ছিল না। বিপদের গন্ধ পেয়ে আগে থেকেই কি চমৎকার টোপ ফেলে রাখল। মোহন চৌধুরী ভালই গণ্ডগোল পাকিয়েছে তাহলে। নন্দিতার ইচ্ছে হল তক্ষুণি পুলিশকে ফোন করে সব বলে দেয়। দেওয়ালে কপাল ঠোকার ব্যথাটা তাহলে জুড়োয় একটু। এতবড় শয়তান যে মাকে সুদ্ধু জড়িয়েছে। মা নিশ্চয় জানে ও কোথায় আছে। যে মা ছোটবেলায় একদিন একটা মিথ্যে কথা বলার জন্য নন্দিতাকে দু'-ঘণ্টা বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিল, সেই মা-ই আজ ওই মোহনের জন্য কেমন অবলীলায় এতগুলো মিথ্যে বলে গেল!

এর তিনদিন পরে প্রকাশ রায় মাকে ফোনে জানাল, অসুবিধে না হলে সেই সন্ধেয় সে আসতে পারে। মা যেন এই ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল। নন্দিতা চেয়ে চেয়ে দেখল, মা কি যত্ন করে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে। হারানকাকুকে খবর পাঠাল সে যেন কয়েকটা বাছাই করা ছেলে নিয়ে সন্ধের সময় অতি অবশ্য আসে। শুধু তাই নয়, নন্দিতাকে অবাক করে সেই দুপুরেই আবার মোহন চৌধুরীও হাজির। কিছুই হয়নি যেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই রুগীর ঘরে ঢুকে তার শরীরের খোঁজ-খবর নিল। ওকে নিয়েই যে বাড়িতে কদিন ধরে চাপা অশান্তি চলছে প্রতাপ বোস ঠিক আঁচ করেছে। যে মানুষ পারতে ওর সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলে না, সেও আজ জিগ্যেস করল, এ কটা দিন ছিলে কোথায়?

—মিহিরের বাড়ি।

কানের সামনে একটা বাজ পড়লেও নন্দিতা এতটা চমকে উঠত না। নিজের অগোচরেই দু'পা এগিয়ে এলো, কোথায় ছিলে বললে ?

বললাম তো, মিহিরের বাড়ি।

প্রতাপ বোস, নন্দিতা দুজনেই হতভম্ব। শমিতা বোসই একমাত্র নির্বিকার। তার মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রথম থেকেই সব জানে। প্রতাপ বোসই আবার জিগ্যেস করল, কেন, মিহিরের বাড়ি কেন ?

—সে অনেক কথা কাকাবাবু। আমার এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাকে নিরিবিলিতে রেখে চিকিৎসার জন্যে ভাল জায়গা খুঁজছিলাম। 'হোলি-গার্ডেন'-এই প্রথমে তুলেছিলাম কিন্তু সেখানে সব সময় নানা লোকের আনাগোনা। তাই সরিয়ে আনতে হল। কাকিমা হারানকাকু আর মিহিরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে মিহিরই এই প্রোপোজাল দিল।

প্রতাপ বোসের দু-চোখ একটু ছোট হয়ে ওর মুখের ওপর বিঁধল, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে এত ফিসফিস কেন ?

—মোহন চৌধুরী যেন ভারী মজার কথা বলছে, আর বলেন কেন ? পয়সাওলা বাড়ির ছেলে, কোথায় মন দিয়ে পড়াশুনো করবি, ভাল রেজাল্ট করে বিদেশ যাবি, টাকা কামাবি, তা না, বাবু নকশাল হয়েছেন। এমন কাণ্ডই করেছে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারলেই গুলি করে মারবে। কদিন আগে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে পায়ে এমন চোট পেয়েছে যে বাছাধন আর ভাল করে হাঁটতে পারে না। কোনো রকমে 'হোলি-গার্ডেন'-এ এসে উঠেছিল, কিন্তু ওখানে রাখাও নিরাপদ নয়। শেষে মিহির এই ভার নিতে সত্যি বেঁচে গেছি।

নন্দিতার মাথার ভেতর তোলপাড় কাণ্ড হচ্ছে। এ-কদিন মিহিরের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো কথা দূরে

থাক, কিছু বুঝতে পর্যন্ত দেয়নি। মোহন এখন এত আপনার যে নন্দিতাকে পর্যন্ত সকলের অবিশ্বাস। মিহিরের সঙ্গে পরে এ নিয়ে বোঝাপড়া তো করবেই, কিন্তু আপাতত মোহনকে এক হাত নেওয়ার ইচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি যদি এখন পুলিশকে সব জানিয়ে দিই ?

মোহন হেসে উঠল, এত লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি ! মিহিরকেই সবথেকে বিপাকে ফেলার রাস্তাটা বাতলালে ? পাঁচ পাঁচটা দিন মিহিরের বাড়িতেই ছেলেটা ছিল, আর তারপর মিহিরই নিজে ড্রাইভ করে ওকে বর্ধমানের দিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

নিষ্ফল আক্রোশে নন্দিতা স্তব্ধ। সামনে যে দাঁড়িয়ে তার তো বটেই, সেই সঙ্গে ওই স্টুপিড মিহিরের মাথাটাও ধড় থেকে ছিঁড়ে আনতে ইচ্ছে করছে। কতবড় শয়তান এই মোহন চৌধুরী ! চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তবে কাজে নেমেছে। মাকে তো সেই কবে থেকেই বশ করেছে, এখন আবার মিহিরকেও ভাল রকম ফাঁদে ফেলেছে। আর বোকা মিহির কি না ওর কথায় ভুলে বীরত্ব দেখাতে নিজেকে এ ভাবে জড়িয়েছে ! নন্দিতাকে কি এরা পাগল করে ছাড়বে ?

সন্ধেবেলা প্রকাশ রায় এলো। নন্দিতা দেখল, আদর করে তাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে মা কাগজ-কলম আনতে গেল, পয়েন্টস লিখবে। হারানকাকু আর 'হোলি-গার্ডেন'-এর কতগুলো ছেলে সেই বিকেল থেকে অন্য একটা ঘরে বসে আছে, তাদের সঙ্গে মোহন চৌধুরীও রয়েছে। মা কাগজ আনার ছুতো করে আসলে তাদের কি সব বলে এলো। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকল, পেছনে বুদ্ধু, তার হাতের ট্রে-তে ড্রিঙ্কের সরঞ্জাম আর খাবারের প্লেট পরিপাটি করে সাজানো।

নন্দিতা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেই যাচ্ছে। মা কেবল ভাল লেখিকাই নয়, নিপুণ অভিনেত্রীও। ভদ্রলোকের সামনে চটপট সব সাজিয়ে দিল। নিজের জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে

সেটা তুলে বলল, চিয়ার্স···নিন, এবার খেতে খেতে আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা যেমন যেমন মনে আসে বলে যান। আমি আমার মত করে নোট নেব। যেখানে দরকার হবে আমিই আপনাকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করব। আপনার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স-গুলো খুব ভাল করে খুঁটিয়ে বলবেন, ওগুলোই তো উপন্যাসের হাই-লাইট হবে।

ভদ্রলোক বিগলিত। এরপর সে ঝাড়া দুটি ঘণ্টা বকে গেছে আর প্যাডের ওপর শমিতা বোসের কলম চলছে। মাঝে মাঝে প্রকাশ রায়কে থামিয়ে এটা ওটা জিগ্যেস করছে, তারপর আবার লিখেছে। তার জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনে শমিতা বোসের চোখে সম্ভ্রম মাখানো বিস্ময়, সত্যি? এমনিতে আপনাকে দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না তো! গলার স্বরেও প্রশংসা ঝরে পড়েছে।

লোকটার জন্য নন্দিতার মায়াই হচ্ছিল।

আলোচনার পাট যখন প্রায় শেষ, ততক্ষণে ভদ্রলোকের গ্লাস তিনবার খালি হয়ে চতুর্থ রাউণ্ড চলছে। এমন সময় দলবলসহ হারানকাকার প্রবেশ। এইমাত্র এলো যেন। তাদের দেখে বিব্রত একটু।—ব্যস্ত নাকি? এসে বিরক্ত করলাম না তো?

নন্দিতা দেখছে মা কি নিপুণ অভিনয় করে যাচ্ছে। —আসুন আসুন, কিছু ব্যস্ত না, এই মাত্র কাজ শেষ হল।···আলাপ করিয়ে দিই, ইনি পুলিশের একজন হর্তাকর্তা, ডি. সি. মিস্টার প্রকাশ রায়। আর ইনি হারান ভট্টাচার্য, ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, আমাদের ফ্যামেলি ফ্রেণ্ড, সারাটা জীবন শুধু পরের ছেলে মানুষ করলেন। আর এরা ওনার সেই সব ছেলে।

প্রকাশ রায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না! মা এবার হারানকাকা আর তার 'হোলি-গার্ডেন'-এর কথা কান পেতে শোনার মত করেই বলেছে। প্রকাশ রায়ের চোখে সম্ভ্রম। হারানকাকাকে বলেছে, আপনি তো মশাই নমস্য ব্যক্তি, আপনার ওখানে একদিন যাব'খন, আমরা পাপীতাপী মানুষ, আপনাদের দেখলেও পুণ্যি।

নন্দিতা দেখছে অভিনয়ে কেউ-ই কম যায় না। হারানকাকার মুখে বিনয়ের হাসি, না না—কি যে বলেন···

এবার এবার মজার ব্যাপার মনে পড়ল যেন শমিতা বোসের। প্রকাশ রায়ের দিকে তাকাল। আরে, লেখার ইন্টারেস্টে আপনাকে কথাটা বলতেই ভুলে গেছি মিস্টার রয়, সেদিন ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলে সবে লিখতে বসেছি, এমন সময় আমার খোঁজে বাড়িতে এক পুলিশ অফিসার এসে হাজির। আমি তো হাঁ, এ কি করে টের পেলে যে আমার শীগগিরই একজন পুলিশের লোক দরকার! শমিতা বোস হেসে উঠল। ছদ্ম ভয় মেশান স্বরে বলল, কিন্তু ও বাবা, পরে দেখি আমাকেই জেরা করতে এসেছেন।

প্রকাশ রায় অবাক, আপনাকে জেরা করতে পুলিশ? কেন?

আর বলেন কেন, শমিতা বোসের হালছাড়া গলা, হারানবাবুর এই ছেলেরা সত্যি রত্ন। আজ প্রায় এক মাস ধরে পালা করে আমার অসুস্থ স্বামীর সেবা করে যাচ্ছে। বেশির ভাগ সময় ওরা এ বাড়িতেই থাকে। ওদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে গোবেচারা, সেটার খোঁজেই সেদিন পুলিশ এসেছিল। কোত্থেকে শুনেছে ও নাকি একটা অ্যান্টিসোসালকে শেল্টার দিয়েছে। অথচ পনের দিন ধরে ছেলেটা কলকাতাতেই ছিল না, আজই ফিরেছে। আছেও আমার এখানেই। তারপর একটু থেমে অনুযোগের সুরে বলল, আপনাদের কারবার, উদোর পিণ্ডি তো হামেশাই আপনারা বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ···সেই এতটুকু বয়েস থেকে ছেলেটাকে জানি। ওর বাবা, এই হারানবাবু আর আমার স্বামী ছেলেবেলার বন্ধু। বাচ্চা বয়সে বাপ-মা খুইয়ে আমাদের কাছেই বড় হয়েছে। সাত চড়ে রা বেরোয় না যে ছেলের তার ওপরেই আপনাদের নজর পড়েছে! শমিতা বোস এবার প্রকাশ রায়কেই চোখ পাকাল— আমিও শেষে ওই পুলিশ অফিসারকে আপনার নাম করেই আচ্ছা দাবড়ানি দিয়েছি, বলেছি, ফের যদি এভাবে জ্বালাতন করে তাহলে আপনাকে জানাতে বাধ্য হব। তখন সমঝেছে। আবার

যাওয়ার সময় বলে গেছে ছেলেটা ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

প্রকাশ রায় ধমকেই উঠল যেন, কোথাও যেতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ছেলেটি কোথায়?

মোহন! ওপরে আমার স্বামীর কাছে বসে আছে। নন্দিতা শুনল, মা আবারও ডাহা মিথ্যে কথা বলল। মোহন বিকেল থেকে মোটেই বাবার কাছে ছিল না। হারানকাকু আর তার ছেলে-গুলোর সঙ্গে অন্য ঘরে বসে ছিল। এদিকে মা বলেই চলেছে, অসুস্থ মানুষ তো, তাই একলা রাখতে পারি না। আর ছেলেটাও অদ্ভুত, একটানা কি সেবাটাই না করল এতদিন! তারপর দিন পনের আগে উনি একটু ভাল হতে কাউকে কিছু না বলে উধাও! অবশ্য কিছু দিন পরপরই এ কাণ্ড করে, পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে আসে। আগে চিন্তা করতাম, কিন্তু এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে।···ডাকব ওকে?

কিচ্ছু দরকার নেই। আপনার ফোনটা কোথায়?

মায়ের বিব্রত মুখ। ফোন এ ঘরেও নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু কেন? আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না তো···প্রকাশ রায় হুমকে উঠল, কিচ্ছু ব্যস্ত না, আমি শুধু ওদের একটু বলে দেব, আপনি ফোনটা আনান।

শমিতা বোস ইশারা করতেই একটা ছেলে ফোনটা নিয়ে এসে প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে দিল। প্রকাশ রায় থানায় ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে কড়া ভাষায় ও. সি-কে ধমকাল। তারপর ফোন ছেড়ে আবার পারফেক্ট জেন্টলম্যান। বলল, আর আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, ওই ছেলেটিকেও থানায় যেতে হবে না।

শমিতা বোসের বিড়ম্বনা-ছোঁয়া হাসি মুখ। কেন এত ঝামেলা করতে গেলেন?···কি আর বলব আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ।

আত্মতুষ্টিতে ভরপুর প্রকাশ রায় আরও এক পেগ শেষ করে

ওঠার আয়োজন করতে নন্দিতা দরজার পাশ থেকে সরে গেল। মা আর মিহির এর মধ্যে না থাকলে এই এক ব্যাপার নিয়েই মোহনকে আচ্ছা করে শাসানো যেত। কিন্তু সবদিক থেকেই যে হাত-পা বাঁধা। তার ওপর আজকের এই নাটক! অসহ্য! ছটফট করতে করতে ওপরে উঠে এলো। ভাবল, বাবার সঙ্গে গল্প করে মনটা একটু হাল্কা করবে! কিন্তু সেখানেও আর এক বিপত্তি।

প্রতাপ বোস মেয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল, গম্ভীর। নানু, কদিনের মধ্যেই আমি ওবাড়ি চলে যাব। তার আগে তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। ঠিক ঠিক উত্তর দিবি।

মনে মনে অবাক হলেও নন্দিতা হেসেই বলল, তোমার কাছে কোনোদিন বেঠিক কথা বলেছি? আমাকেও তুমি বিশ্বাস কর না?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না। আমি জানতে চাই শেষ পর্যন্ত ঠিক কার সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে, মিহিরের না মোহনের?

নন্দিতা হতভম্ব প্রথমে। মোহন! তার মানে? এতদিন ধরে তুমি জান না কার সঙ্গে বিয়েটা হবে? আর এ ব্যাপারে মিহিরের সঙ্গে ওই রাস্কেলটার নাম তুমি করলে কি করে?

মাথা ঠাণ্ডা করে শোন আগে. প্রতাপ বোস তেমনি গম্ভীর। —সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত তোর সব ব্যাপারে তোর মা-ই ডিসিশন নিয়ে এসেছে। সে যা চেয়েছে আল্টিমেটলি তা-ই হয়েছে। তুই বুঝতেও পারিসনি। মোহন ছেলেটা এমনিতে কিছু খারাপ না। ওর বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বাচ্চা বয়সে বাপ-মা খুইয়েছে বলে ছেলেটার জন্যে আমারও কম মায়া ছিল না। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম যে কারণেই হোক ছেলেটা সেরকম হয়ে উঠতে পারেনি! অবশ্য তার জন্যে ওকে আমি এত-টুকু দোষ দিই না। তাছাড়া এবারে আমার প্রাণটাই বলতে গেলে ওর হাত দিয়ে ফিরে পেয়েছি। সে কথা আলাদা, কিন্তু তোর মা ওকে যেরকম পছন্দ করে, আমার চিন্তা সেই ইনফ্লুয়েন্সে তুইও না একদিন মন পাল্টাস। মিহিরের সঙ্গে তোর মা ভদ্রতা করে, কিন্তু

সত্যিকারের ভালবাসে ওই মোহনকে। মুখে যতই ওকে গালাগাল করিস, নিজের মন ভাল করে বুঝে দেখ ডিসিসান পাক্কা কি না! ···এটা আমারই সবথেকে আগে জানা দরকার!

বাবার শেষ কথাটা নন্দিতা খেয়াল করল না, রাগে তখন জ্বলছে। মা! তলায় তলায় মা এই প্ল্যান করেছে! মিহিরের সঙ্গে ও কতখানি ঘনিষ্ঠ সেটা মা-র মত বুদ্ধিমতী মহিলার না বোঝার কথা নয়। সব জেনেশুনেও এ ধরনের চিন্তা তার মাথায় এলো কি করে? নিজের স্বার্থে মা এতই অন্ধ যে একমাত্র মেয়েকেও এ-ভাবে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলার কথা ভাবতে পেরেছে? স্বার্থ ছাড়া কি? হারানকাকার সঙ্গে মায়ের আসল সম্পর্কটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে নন্দিতা। লোক দেখানো ঢং করে বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সমস্ত শো-অফ আসলে। সেই কবে একটা ছুতো করে বাবার কাছ থেকে সরে গেছে, সোসাল ওয়ার্কের নাম করে যখন তখন হারানকাকার ওখানে যায়, থাকে, নিজের ইচ্ছেমত চলে। এখন বয়স হওয়াতে চিন্তা হয়েছে সবকিছু কি করে হাতের মুঠোয় রাখবে! তাই নন্দিতাকে টোপ করেছে। মোহন চৌধুরীর চেয়ে ভাল ছেলে সেই জন্যই আর চোখে পড়ে না। নন্দিতা এতদিন ভেবেছিল ওই মিটমিটে শয়তানই মাকে কব্জা করেছে। এখন বুঝছে মা-কে কারুর কব্জা করার আগে তাকে আর একবার জন্ম নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে মোহনের কিছু একটা প্যাক্ট হয়েছেই! নয়তো ওই রাস্কেল এ পর্যন্ত ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, আর কেউ হলে তা চিন্তা পর্যন্ত করতে সাহস পেত না।

অন্ধ রাগে চোখে ঝাপসা দেখছে নন্দিতা। চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমার ডিসিসান শতকরা একশো ভাগ পাকা, আমি ওই মোহন চৌধুরীকে একটা স্কাউন্ড্রেল ভাবি, বুঝলে? কালই মিহিরকে রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দিতে বলছি, যতদিন না বিয়ে হয় আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ও বাড়িতে থাকব।

প্রতাপ বোস কিছু বলার আগেই ছুটে নিজের ঘরে এসে

বিছানায় আছড়ে পড়ল। ভেতরটা জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।

কতক্ষণ কেটেছে নন্দিতা জানে না। হঠাৎ ঘরে আর কেউ আছে মনে হতে মুখ তুলে দেখে দু'হাতের মধ্যে মোহন চৌধুরী দাঁড়িয়ে. ওকেই দেখছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জড়ো হল। চেঁচিয়ে উঠল, এখানে কি চাই ?

কাকাবাবুর ঘরে ওরকম চিৎকার করছিলে কেন ? তোমার গলা শুনে আমি দৌড়ে এসেছি, এখন এতটুকু এক্সাইট্‌মেন্টেও ওঁর ক্ষতি হতে পারে জানো না ?

নন্দিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, মেয়েদের ঘরে ঢুকতে হলে যে আগে পারমিশান নিতে হয় জানো না ?

ও, এই ? মোহন হেসে উঠল। তা এক একজনের বেলায় এক এক রকম নিয়ম কি করে বুঝবে বল ? তারপর ওকে আরও রাগানোর জন্য বলল, মিহির তো যখন-তখন এঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

রাগে নন্দিতা এবার পুরোপুরি জ্ঞান হারাল। ঝুঁকে মেঝে থেকে জুতোটা তুলে নিয়ে মোহনের নাক মুখ বেড়িয়ে বিষম জোরে মেরে বসল। সঙ্গে হিস্টিরিয়া রুগীর মত চিৎকার, স্কাউন্ড্রেল ! বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি বেরোও বলছি, আর কখনো যেন এ বাড়িতে না দেখি।

হিলতোলা জুতোর ঘায়ে চোখের নিচটা কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। মোহন চৌধুরী তাজ্জব, নির্বাক।

নন্দিতার চিৎকার শুনে ঘরের মধ্যে শমিতা বোস আর হারান ভট্‌চায ছুটে এসেছে। মোহন আস্তে আস্তে ঘুরে তাদের দেখল। ঠোঁটের কোণায় ভারী অদ্ভুত রকমের একটু হাসি। জামার হাতায় রক্তাক্ত চোখের তলা মুছে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোজা নিচে, তারপর একেবারে রাস্তায়।

নন্দিতার হাতে তখনো একপাটি জুতো। নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে।

শমিতা বোস এক হাতের মধ্যে এগিয়ে এলো। মায়ের এই মূর্তি নন্দিতা জীবনে দেখেনি। মুখ অস্বাভাবিক লাল, দু'চোখ ধক-ধক করছে, একটা হাত তলোয়ারের ফলার মত ওপরে উঠে গেল, তারপর ওর মুখের ওপর নেমে আসার আগেই হারানকাকা শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল।

ছাড়ুন, ছাড়ুন! গলার স্বরে হিসহিস আগুন। ওই ছেলেটাকে যা করেছে ওরও আজ সেই অবস্থা করে ছাড়ব—

আঃ শমিতা! ছেলেমানুষি কোর না, আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

শমিতা বোসের আগুন-ঝলসানো দু'চোখ নন্দিতার মুখের ওপর। ক্ষিপ্ত আক্রোশে একটি একটি করে বলল, মোহন কি করেছে? কার বাড়ি থেকে তুই কাকে তাড়ালি?

এবারে নন্দিতার চোখে মুখে দুর্বোধ্য বিস্ময়, হাত থেকে জুতোটা খসে পড়ল।

শমিতা বোস হারান ভট্‌চাযের হাত ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে এসে নন্দিতার বাহু ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বলল, বল? কার বাড়ি থেকে কাকে এভাবে মেরে তাড়ালি তুই? এই ঘরদোর বাড়ি গাড়ি সব মোহনের, সব সব! আমরাই ওর বাড়িতে থাকি—

নন্দিতার স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল, কি শুনছে বুঝছে না। মা তখনো রাগে কাঁপছে। হারানকাকু তাকে ধরে খাটের একপাশে বসিয়ে দিয়ে বলল, আগে একটু ঠাণ্ডা হও তো—

দুবার বড় করে দম নিয়ে শমিতা বোস আত্মস্থ গলায় বলল, আপনি ওঘরে যান। এবার সময় হয়েছে। আমি নানুর সঙ্গে কথা বলব।

রাত কত নন্দিতা জানে না। পৃথিবী আগের মতই তার নিয়মে চলছে কিনা তাও জানে না। ঘরে এখন ও একলা। মা অনেক-ক্ষণ আগে চলে গেছে। ওর জীবনের সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য আঘাতে নন্দিতার জগৎ বড় আচমকা থেমে গেছে। বুকের ভেতরে রক্ত ঝরছে। মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়েই চলেছে। মা যা যা বলে গেল তা কি সব বিশ্বাস করবে? সব? স—ব?

মায়ের কথাগুলো সিনেমার ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল।

প্রতাপ বোস, হারান ভট্টাচার্য আর রমেন চৌধুরী—সেই ছোট্ট-বেলা থেকে হরিহর-আত্মা ছিল। কলেজ ছাড়ার পর তিনজনের কর্মক্ষেত্র তিনদিকে বাঁক নিল। হারান ভট্‌চায ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা সত্ত্বেও নিজের ছন্নছাড়া মতির কারণে কোন অজগাঁয়ের স্কুল-মাস্টার, রমেন চৌধুরী ছোট থেকে ক্রমশ বড় হার্ড-অয়্যার মার্চেন্ট, আর ল'পাশ করার পর বিদেশ থেকে ঐ বিষয়েই হায়ার স্টাডি করে প্রতাপ বোস তার বাবার সলিসিটর ফার্মের পার্টনার। বিদেশে থাকতে প্রতাপ বোসের সঙ্গে রমেন চৌধুরীর বরাবরই চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। সেখানে থাকতে থাকতেই রমেনের বিয়ের খবর পেয়েছে, ব্যবসার খবর জেনেছে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে তার ছেলে হবার সুখবর এসেছে, আর তার দুবছরের মাথায় ঐ শিশু রেখে ওর বউয়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবরও পৌঁচেছে। কিন্তু রমেন চৌধুরীর কোনো চিঠিতেই হারান ভট্‌চাযের খবর নেই, সে নিপাত্তা।

বিয়ের মাত্র তিন বছরের মধ্যে বউ খুইয়ে রমেন চৌধুরী যে আর বিয়েই করবে না কেউ তা ভাবেনি। বিদেশ থেকে ফিরে রমেনের দুধের শিশুটার কথা ভেবেই প্রতাপ বোস তাকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিল। রমেন চৌধুরীর ব্যবসা তখন দারুণ জমজমাট। তবু আবার সংসারী হবার কথায় আর কানই পাতল না। এদিকে বাচ্চাটার জন্য মহা দুশ্চিন্তা। ছেলেটার দেখাশুনোর জন্য দু'দুটো লোক আছে, একটা আয়া আছে। পয়সায় সব পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা মেলে না। বন্ধুর ছেলেটার জন্য প্রতাপ বোসের মনেও কম চিন্তা ছিল না। বাচ্চা বয়সে মা হারিয়ে ছেলেটা তখন থেকেই একটু অন্যরকম। শিশুসুলভ দৌরাত্ম্য বা হাসিখুশি একেবারেই নেই, বড় বেশী চুপচাপ।

ইতিমধ্যে শমিতার সঙ্গে প্রতাপ বোসের আলাপ ও বিয়ে। বৌ-ভাতের দিন রমেন চৌধুরীর ছেলেটাকে প্রথম দেখা থেকেই শমিতার বুকের ভেতর মোচড় পড়েছিল। ফর্সা রং, একমাথা কোঁকড়া চুল আর অদ্ভুত মায়াবী দুটো ডাগর চোখ। নামটাও মিষ্টি, মোহন। এরপর থেকে যখনই শমিতা রমেন চৌধুরীর বাড়ি যেত, ছেলেটার জন্য নানারকম খেলনাপাতি চকলেট-লজেন্স এসব আনত। কিন্তু ওইটুকু ছেলে সেসবে ভুলত না, এমন কি ফিরে তাকাতোও না। বরং শমিতার কোল ঘেঁষে চুপ করে বসে থাকতেই বেশি ভালবাসত। রমেন চৌধুরী দুশ্চিন্তা করে মাঝে মাঝেই বলত, কি যে করি ছেলেটাকে নিয়ে, ভাবছি ওকে কোন বোর্ডিং-স্কুলেই দিয়ে দেব। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে মিশলে যদি স্বাভাবিক হয়···

অতটুকু ছেলে ঠিক বুঝতে পারত যে ওকে সরানোর কথা হচ্ছে। প্রাণপণে শমিতাকে আঁকড়ে ধরে মাথা নাড়ত। সে কোথাও যাবে না। রমেন চৌধুরী জিগ্যেস করত, তাহলে সারাদিন কার কাছে থাকবি?

ছোট্ট মোহন আঙুল তুলে শমিতাকে দেখাত, তার কাছে থাকবে।

সাত আট বছর বয়সে ভালরকম অসুখে পড়ল মোহন। জ্বর আর নামেই না। পরে ধরা পড়ল টাইফয়েড। সেই দিনে টাইফয়েড খুব সহজ ব্যাপার নয়। টানা দু'মাস বিছানায়। প্রথম দিন কতক তো যমে-মানুষে টানাটানি। শমিতা তখন দিনের পর দিন এই বাড়িতে মোহনের মাথার কাছে বসে কাটিয়েছে। প্রতাপ বোস দুবেলা আসত। হারান ভট্‌চায ভোরবেলা চলে এসে রাত পর্যন্ত থাকত। কিন্তু যত রাতই হোক তাকে 'হোলি-গার্ডেন'-এ ফিরে যেতেই হত। তখনকার 'হোলি গার্ডেন'-এর সঙ্গে আজকের 'হোলি গার্ডেন'-এর অনেক তফাৎ ছিল। ছোট ছোট কয়েকটা অনাথ শিশু এক চিলতে চালাঘরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে জড়াজড়ি করে বসে থাকত হারান ভট্‌চায না ফেরা পর্যন্ত।

মোহন বড় বড় ডাক্তারদের চিকিৎসা এবং শমিতা আর হারান ভট্‌চাযের অক্লান্ত সেবায় সেবারকার মত সামলে উঠল বটে, কিন্তু একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল মনের দিক থেকে। আগে থেকেই আর পাঁচটা বাচ্চার মতন ছিল না, এবার এই অসুখ থেকে ওঠার পর পুরোপুরি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। একেবারে চুপ, দিন-রাত কি ভাবে আর নিঃশব্দে দুই ঠোঁট নড়ে। নিজের মনে কথা বলে। দুশ্চিন্তায় রমেন চৌধুরীর পাগল হবার যোগাড়। প্রতাপ বোস আর শমিতাও ভেবে পায় না কিছু। হাল ধরল হারান ভট্‌চায। পুরুষ মানুষ হয়েও সে মায়ের মত মোহনের সঙ্গে মিশতে লাগল। ওকে চান করানো, খাওয়ানো, খেলার ছলে পড়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—সব নিজের হাতে তুলে নিল। মোহনের তখন দুনিয়ায় সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল এই একটিমাত্র লোকের ওপর সমস্ত টান আর বিশ্বাস।

এদিকে একের পর এক ঘা খেতে খেতে তার দুশ্চিন্তায় রমেন চৌধুরীর ভেতরে যে এতবড় ভাঙন শুরু হয়েছিল তা সে নিজেও

টের পায় নি। অনেকখানি গড়িয়ে যাবার পর ধরা পড়ল পেটে ক্যান্সার। অনেকদিন ধরেই পেটটা চিনচিন করত, গা গুলত, খেতে পারত না, কিন্তু কেয়ার করে নি। টুকিটাকি ওষুধ-বিষুধ খেয়ে চালিয়ে গেছে। অসুখ ধরা পড়ল একেবারে শেষ সময়ে।

রমেন চৌধুরী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। প্রথমেই চালু ব্যবসা মোটা দরে বেচে দিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করেছে! তারপর হারান ভট্‌চায প্রতাপ বোস আর শমিতাকে ডেকেছে। সমস্ত বলেছে তাদের। শুনে সবাই স্তম্ভিত। রমেন চৌধুরী জানিয়েছে, নিজের জন্যে যে এতটুকু ভাবে না; তার সমস্ত চিন্তা মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে। তার একান্ত ইচ্ছে হারান যেন মোহনের লেখাপড়ার আর তাকে মানুষ করার ভার নেয়। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব প্রতাপ বোস আর হারান ভট্‌চায দুজনের। মোহন মানুষ হলে একুশ বছরের আগেই মারা যায়, বা অপরিণত মস্তিষ্ক হয়, বা কোনোরকম অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে দেখা দেয় তাহলে প্রতাপ বোস আর হারান ভট্‌চায দুজনে মিলে যা সবথেকে ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে। একে বাচ্চা বয়স থেকে মা হারিয়ে মোহন বরাবরই একটু অন্যরকম, তার ওপর অতবড় অসুখ থেকে ওঠার পর তো প্রায় অ্যাবনরমালই হয়ে গিয়েছিল। তাই রমেন চৌধুরীর ভাবনা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক হবে কি না।

হারান ভট্‌চায বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে থাকতে কিছুতেই রাজি হল না। তার সাফ কথা মোহনের অন্য সব দায়দায়িত্ব তো এখনই নিয়েছে, কিন্তু বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে তাকে মাফ করতে হবে। বলেছে, কাঙালকে বিত্তের লোভ দেখাতে নেই। ও দিকটা প্রতাপ একাই দেখুক। সে নিজেও এ-সব নিয়েই আছে, ফলে এগুলো সে-ই সবথেকে ভাল বুঝবে।

শমিতা তো ব্যাপার শুনে প্রথম থেকেই চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিল। রমেন চৌধুরীই প্রায় এক তরফা কথাবার্তা বলছিল।

হারান ভট্‌চায কিছুতেই রাজি না হওয়াতে একা প্রতাপ বোসই নাবালকের অছি থাকল। সম্পত্তি বলতে এই বাড়ি, ব্যাঙ্কে নগদ লাখ দশেক টাকা আর শমিতা বোস এখন যে অস্টিন গাড়িটা ব্যবহার করে সেই গাড়ি। রমেন চৌধুরী বলেছিল, তার মৃত্যুর পরে গাড়িটা বেচে মোহনের নামে যেন টাকাটা জমা করে দেওয়া হয়। আর মোহনের খরচার জন্যে হারান যা বলবে প্রতাপ যেন মাসে মাসে তাই দেয়।

জীবন সম্পর্কে বন্ধুর এই হতাশা প্রতাপ বোস মেনে নিতে চায়নি। বলেছে, ঠিক আছে, তোর ইচ্ছে মতই সব করব আমরা, কিন্তু তুই শেষ ধরেই নিচ্ছিস কেন? দরকার হলে চিকিৎসার জন্যে তোকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব।

রমেন চৌধুরী হেসেছে, ছেলেটার মুখ চেয়েই শেষ চেষ্টা একটা করব, কিন্তু লাভ হবে না, দিন যে ফুরিয়েছে সে সিগনাল পেয়ে গেছি।

এর চার মাসের মধ্যে রমেন চৌধুরী চোখ বুজেছে। বিদেশের চিকিৎসা, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, টোটকা—কোনোটাতেই কিচ্ছু ফল হয়নি। মোহনের বয়স তখন বছব বারো। নন্দিতার চার-পাঁচ হবে। ওর তাই এসব কিছুই মনে নেই।

ঘরদোর বাড়িগাড়ি সব প্রতাপ বসুর জিম্মায় রেখে হারান ভট্‌চায মোহনকে বুকে করে বরবারের মতই নিজের কাছে নিয়ে গেল। প্রতাপ বোস আর শমিতা মোহনকে ছাড়তে চায়নি, তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হারান ভট্‌চায হাসিমুখেই আপত্তি জানিয়েছে, বলেছে, রমেন ওকে মানুষ করার ভার একলা আমাকে দিয়ে গেছে। আমার কাছে না থাকলে যে দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। মোহনও হারান ভট্‌চাযকে আঁকড়ে ধরেছে। সে প্রতাপ বোসদের বাড়িতে থাকতে রাজি নয়, 'হোলি-গার্ডেন'-এ তার হারানকাকুর কাছে থাকবে।

রমেন চৌধুরীর মৃত্যুতে হাসি গল্প বেড়ানো—সব কিছুতেই

একটা ছেদ পড়ে গেল। প্রতাপ বোস তার কাজ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত, শমিতা লেখায় ডুব দিয়েছে। আর 'হারান ভট্‌চায তার 'হোলি-গার্ডেন-কে বড় করে তোলার কাজে মগ্ন। সারাদিনে এক মিনিট মোহনকে বসার অবকাশ দিত না, সব কাজে ঠেলে দিত। মাঝে মাঝেই ওখানে যেত শমিতা। মোহনকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখত। এ নিয়ে একদিন কি বলতেই হারান ভট্‌চায হেসে জবাব দিয়েছিল, ওর জন্যে যেটা সব থেকে ভাল আমি তাই করছি। এই শোক না হাল্কা হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দিলে ও পাগল হয়ে যাবে। শমিতা, এখানে ছেলেরা যেভাবে কষ্ট করে বড় হয়, দেখে তোমার খারাপ লাগে জানি। কিন্তু এই কষ্টটুকু না করতে শিখলে ওদেরই সবচেয়ে ক্ষতি। মোহনের জন্যে তোমরা ভেব না। বঙ্কিম চাটুজ্জে 'দেবী চৌধুরানী'তে যে খাঁটি ইস্পাতের কথা বলেছিলেন, ও অনেকটা সেইরকম।

শমিতা মোহনের ব্যাপারে তাকে আর কখনো কিছু বলেনি। ক্রমশ হারান ভট্‌চাযের আসা কমেছে কিন্তু শমিতা বোসের ওখানে যাওয়া বেড়েছে। ছোট্ট নন্দিতাকে নিয়ে প্রায় ওখানে বেড়াতে যেত।

একটা বয়স্ক মানুষ আর কতগুলো ছোট ছোট ছেলের উৎসাহে চেষ্টায় যত্নে আর অক্লান্ত পরিশ্রমে 'হোলি-গার্ডেন' আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল। শমিতা বোসও যথাসাধ্য সাহায্য করত। এদিক ওদিক থেকে মোটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করে দিত। লেখার মারফত তার নিজস্ব জগৎ যত বড় হয়েছে, 'হোলি-গার্ডেন'-এর পেট্রনের সংখ্যাও তত বেড়েছে। তাছাড়া হারান ভট্‌চাযের নিজস্ব উদ্যোগের তো কথাই নেই। প্রতাপ বোসের সঙ্গেই বরং তার যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। কাজ নিয়ে, পশার নিয়ে প্রতাপ বোস নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। রাতে শুতে শুতে প্রায়ই দুটো তিনটে বেজে যায়। টাকাও আসছিল স্রোতের মত। একতলাটা অফিস করেছে। অফিস বন্ধ হওয়ার পরেও ওখানেই বসেই পড়াশুনো করে। রাতের খাবারও প্রায় দিনই ওখানেই দিয়ে আসা হয়। শমিতা প্রথম প্রথম না খেয়ে

বসে থাকত। পরে দেখেছে মানুষটা তাতে বিরক্ত হয়। কাজে যখন ডুবে থাকে তখন আড়াল থেকে প্রায়ই চেয়ে চেয়ে দেখত। পুরুষের এই কর্মী রূপ সত্যিই ভাল লাগার মত। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব সঙ্গোপনে একটু ব্যথাও শমিতার বুকের ভেতরে চিনচিন করে উঠত। পাশে থেকেও লোকটা যেন কাজের নেশাতেই আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। তার নিজেরও লেখা বেড়েছে, নামডাক ছড়াচ্ছে, সময় কমছে। তবু এক একসময় বড্ড ফাঁকা লাগত।

রমেন চৌধুরী মারা যাবার পর প্রথম ক'মাস প্রতাপ বোস নিয়মিত মোহনের খবরাখবর নিত। ওর জন্য কত লাগবে জিগ্যেস করলে প্রত্যেকবারই হারান ভট্‌চাযের এক উত্তর, আলাদা করে মোহনের জন্যে কিছুই দিতে হবে না, তাহলে ওখানকার অন্য ছেলেদের সঙ্গে আপনা থেকেই ওর একটা তফাত গড়ে উঠবে। আর পাঁচটা ছেলে যেভাবে বড় হচ্ছে ও-ও ঠিক সেভাবেই বড় হোক। 'হোলি-গার্ডেন'-এর জন্যে বরং মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিলে ভাল হয়।

রমেন চৌধুরীর গাড়ি বিক্রি নিয়ে প্রতাপ বোস আর শমিতার একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। প্রায় বছর ঘুরতে চলেছে, অথচ গাড়ি বিক্রির নাম নেই। এ নিয়ে অনুযোগ করলে প্রতাপ বোস বলত, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, এখন ফালতু ঝামেলা নিয়ে বিরক্ত কোর না তো—

এরপর শমিতা নিজেই গাড়িটা কেনার পার্টি যোগাড় করতে প্রতাপ বোস ক্ষেপে লাল, সব ব্যাপারে তোমার বাড়াবাড়ি। ও গাড়ি এখন বিক্রি করব না, যেমন আছে থাক।

—কিন্তু রমেনবাবু গাড়ি বিক্রি করে সে টাকা মোহনের নামে জমা করে দিতে বলেছিলেন।

প্রতাপ বোসের অসহিষ্ণু জবাব, গাড়ির মেইন্টেনেন্স-এর কথা চিন্তা করেই ও-কথা বলেছিল। সে খরচ তো আমিই চালাচ্ছি।

—এখন তাহলে গাড়িটা নিয়ে কি করবে?

—যেমন আছে তেমন থাক! এরকম অস্টিন এখন আর পাওয়া যায় না। ···মোহনের একুশ বছর হলে সবই তো ওর কাছে যাবে। তুমিই বরং এখন ওটা ইউজ করো, না চললে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সেই থেকে রমেন চৌধুরীর এই অস্টিন শমিতা বোসের হেফাজতে। তখনো পর্যন্ত অন্যরকম কিছু মনে হয়নি। ভেবেছে বন্ধুর এত শখের গাড়ি, তাই বেচতে মন চাইছে না। কিন্তু বড় রকমের ধাক্কা খেল অনেক বছর পরে, মোহনের বয়স একুশ হওয়ার মাসকতক আগে।

একদিন শমিতা প্রতাপ বোসের টেবল পরিষ্কার করতে করতে আঁকিবুকি কাটা একটা কাগজ ফেলতে গিয়েও ফেলল না। হিসেবের এক জায়গায় মোহনের নাম দেখে আপনা থেকেই চোখ আটকে গেল। প্রতাপ বোস তার নিজস্ব যাবতীয় সম্পত্তির হিসেবের সঙ্গে মোহনেরটাও ধরেছে! তারপর বাদ দিয়েছে, তারপর আবার যোগ করেছে, তারপর আবার বাদ দিয়েছে। অনেকবার এরকম করেছে। শেষ পযন্ত মোহনের সম্পত্তির অংকটার চারপাশে লাল পেন্সিলের একটা গোল দাগ দিয়ে রেখেছে।

সেই থেকে ভিতরে ভিতরে শমিতা বোসের একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। লাল পেন্সিলের গোল দাগটা অশুভ সংকেতের মত বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মোহনের একুশ বছর হতে তখন আর ঠিক পনেরো দিন বাকি। ওই পনেরোটা দিন শমিতা একটা চাপা অশান্তিতে ছটফট করে কাটিয়েছে। তারপর আরও দু'তিনটে দিন। মোহন, হারান ভট্‌চায—কারুরই এ এ ব্যাপারে কোনো রকম হুঁশ নেই। একে একে আরো পাঁচটা দিন কাটার পর শমিতা প্রতাপ বোসকে ধরেছে, মোহনের বয়স তো একুশ হল, ওর জিনিস এবার ওকে বুঝে নিতে বল, পরের বোঝা যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামে, ততোই ভাল।

প্রতাপ বোস গভীর মনোযোগে আইনের বই পড়ছিল।

—কি হল, আমার কথা শুনতে পেলে ?

—সব শুনেছি, প্রতাপ বোস ভয়ানক গম্ভীর, এটা আমার ব্যাপার, তুমি এসবে একটু কম মাথা গলিও।

দু'চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শমিতার। জিগ্যেস করেছে, মোহন, হারানবাবু, ওদের তুমি কবে ডাকবে ?

—আমার সময় হলে। বললাম তো তুমি এ ব্যাপারে মাথা গলিও না। প্রতাপ বোসের সাফ জবাব।

শমিতা তখনকার মত চুপ করেছে। তারপর একটা একটা করে দিন গুনে টানা দুটো মাস অপেক্ষা করেছে। কিন্তু প্রতাপ বসুর সময় হয়নি।

ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে শমিতার। হারান বাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারেই কথা বলতে 'হোলি গার্ডেন'-এ ছুটে গেছল। কিন্তু ওই ভদ্রলোকও আশ্চর্য রকমের চুপ। শমিতা তারপর মোহনকেই ধরেছে। মোহন প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি। শেষে জোর করাতে বলেছে। সব শুনে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে শমিতা বোসের।

কিছুদিন আগে অর্থাৎ মোহনের একুশ হওয়ার পর হারান ভট্‌চায এ ব্যাপারে নিয়ে প্রতাপ বোসের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। কিন্তু প্রতাপ বোস তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, মোহন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে সে নারাজ। হারান ভট্‌চায এরপর মোহনকেই পাঠাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও বেঁকে বসেছে, বলেছে, কাকাবাবু খুব ভাল করেই জানেন আমার সব ব্যাপারে তুমি যা ঠিক করো তাই হয়, এ ব্যাপারেও তোমার সঙ্গেই ওনাকে কথা বলতে হবে। আমি শুধু সঙ্গে থাকতে পারি, তারপর যেখানে যেখানে সই দরকার, করব।

হারান ভট্‌চায আবার এনে প্রতাপ বোসকে মোহনের বক্তব্য জানিয়েছে। এবার তাকেই প্রতাপ বোস জিগ্যেস করেছে, বিষয়-

সম্পত্তি নিয়ে মোহনের কি করার ইচ্ছে। হারান ভট্‌চায বলেছে, 'হোলি-গার্ডেন'কে যতটা সম্ভব বাড়ানোর ইচ্ছে। প্রতাপ বোসের গভীর মুখে একটু হাসির আঁচড়, অর্থাৎ যা ভেবেছি তাই। মুখে বলেছে, রক্ত জল করা টাকা ঢেলে 'হোলি-গার্ডেন'কে বড় করার কোনো রকম বাসনা রমেনের কোনোদিনও ছিল না। তাছাড়া সে আরও বলেছিল, মোহন মানুষ হলে তবেই একুশ বছর বয়সে সব পাবে। একটু থেমে প্রতাপ বোস এবার মন্তব্য করেছে,মোহন যা করছে খুবই ভাল, কিন্তু সে অর্থে মানুষ হয়েছে কি? বি. এ-টাও বোধ হয় পাশ করেনি?

হারান ভট্‌চায অপমানিত বোধ করেছে। বলেছে, মোহন অনেক আগেই প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করেছে, ভাল রেজাল্টও করেছে। আর মানুষ হয়েছে কিনা, বা কি রকম মানুষ হয়েছে, সে বিচারের ভার আমাদের কারুরই নয়।

প্রতাপ বোস তেতে উঠেছে, খানিকটা আমার বৈকি! অতবড় সম্পত্তি হাতে তুলে দেবার আগে আমি যাচাই করে নেব ও এগুলো সামলাতে পারবে কিনা, বা সে ক্ষমতা ওর হয়েছে কিনা। রমেনের এত কষ্টের বিষয় এইভাবে আমি নষ্ট হতে দেব না।

হারান ভট্‌চায এ কথার পর উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুকে বলেছিল, ঠিকই বলেছিস, মোহন ঠিক তোদের অর্থে মানুষ হয়নি, আর সেটা হয়নি বলেই এখন আমার গর্ব হচ্ছে। আচ্ছা চলি, আর কখনো এ নিয়ে তোকে বিরক্ত করতে আসব না।

সব শুনে শমিতা বোস স্তব্ধ। মানুষটা তো কোনো দিন অসৎ ছিল না! এই লোকই না একদিন তার গল্প লিখে প্রাইজ পাওয়া নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল? উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তুলেছিল?···না, শমিতা বোসের দৃঢ় বিশ্বাস এরা যা ভাবছে তা নয়, তা হতে পারে না। নিশ্চয় এদের বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে।

এই ভুলটা বার করার জন্যই অধীর হয়ে শমিতা এরপর স্বামীর

সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসেছে। আর, সেই বোঝাপড়া নিয়েই দুজনের সম্পর্কে এতবড় ফাটল।

প্রতাপ বোসের সাফ জবাব, মোহনের হাতে এখন সবকিছু তুলে দেওয়া মানেই সব জলে ফেলা। হারানের ছায়ায় থেকে ওর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু গড়ে ওঠেনি। হারান যেভাবে চাইবে, ও সেই মত চলবে। হাতে টাকা পাওয়া মাত্র ওই 'হোলি-গার্ডেন'-এ ঢালবে। বেঁচে থাকলে রমেন এটা কক্ষণো বরদাস্ত করত না, এখন আমিও করব না। এর জন্যে যদি কোর্টকাছারি করে তো করুক। তাহলেও বোঝা যাবে ছেলেটার খানিকটা মুরোদ আছে।

এরপর শমিতা বোস একটি একটি করে বলেছে, নিজের সম্পত্তির সঙ্গে মোহনের সম্পত্তি জোড়ার খেলাটা শুরু করেছিলে কবে থেকে ?···সেই হিসেবের কাগজটা আমি রেখে দিয়েছি।

প্রতাপ বোস স্ত্রীর কথা শুনে ক্ষিপ্ত। আঙুল তুলে বলেছে, বানিয়ে বানিয়ে গল্প ফেঁদে বসতে পারো, কিন্তু আমি কি জন্যে কি করি বা না করি সেটা তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই, বুঝলে ? এসব ব্যাপারে দয়া করে মাথা গলাতে এসো না।

শেষ আশাটুকুও ধূলিসাৎ। চারপাশে গোল করে লাল দাগ দেওয়া টাকার একটা অঙ্ক শমিতা বোসের চোখের সামনে রক্তের চাকার মত বারবার ভেসে উঠেছে। প্রথম দিনই মনের তলায় অশুভ সংকেত পেয়েছিল। তখন প্রাণপণে সেটাকে নাকচ করতে চেষ্টা করেছে। প্রতাপ বোস একদিন বলেছিল, পুরুষ মানুষের কাজের নেশা আর টাকার নেশা যে কি জিনিস তা মেয়েদের বোঝা শক্ত। কিন্তু শমিতা বোস এখন খুব ভাল করেই সেটা বুঝতে পেরেছে।

অনেকদিন থেকেই মানুষটা দূরে সরে যাচ্ছিল, তা বলে এত দূরে সেটা বুঝতে পারেনি শমিতা। বুকের তলায় সব খোয়ানোর হাহাকার নিয়ে কদিন নিজের সঙ্গেই যুঝে গেছে। তারপর স্বামীকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। বলেছে, হয় এক মাসের মধ্যে মোহনকে সব বুঝিয়ে দেবে, নয়তো আমি এ বাড়ি ছাড়ব।

প্রতাপ বোস ব্যঙ্গ করে উঠেছে, যাবে কোথায় ? ওই তোমাদের 'হোলি-গার্ডেন'-এ ?

শমিতার ঠাণ্ডা জবাব, ঠিক তাই। কিন্তু আমি এখানো আশা রাখি তার দরকার হবে না, এক মাসের মধ্যে মোহনকে তুমি সব বুঝিয়ে দেবে।

এ কথার জবাবও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি প্রতাপ বোস।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেছে। প্রত্যেকটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে থেকেছে শমিতা। আজ নিশ্চয়ই মোহনকে ডাকবে। তারপর দ্বিগুণ হতাশা। আবার পরের দিনের অপেক্ষা, আবারও হতাশায় ডুবে যাওয়া। একটা মাসের প্রত্যেকটা মুহূর্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে শমিতা বোস। কিন্তু ফলাফল শূন্য। ব্যাপারটা প্রতাপ বোসের মাথায় আছে বলেও মনে হয়নি।

শমিতা বোস এরপরের প্রস্তুতি খুব নিঃশব্দে নিয়েছে। নন্দিতাকে হস্টেলে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করেছে। মেয়ের গার্জেন হিসেবে বরাবরই দুজনের নাম ছিল। তাই ও ব্যাপারে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি। নন্দিতা বোর্ডিং-এ না যাওয়া পর্যন্ত ফার্নিচার সাজানোর ছুতোয় ডবলবেডের খাট পৃথক করে নিজের বিছানা আলাদা করেছে। সব ব্যবস্থা করে ওকে হস্টেলে পাঠাবার ঠিক চারদিন আগে স্বামীকে সব জানিয়েছে। ক্ষেপে উঠতে গিয়েও থমকেছে প্রতাপ বোস। স্ত্রীর এই মুখ আগে কখনও দেখেনি। যা ঠিক করেছে তার যে কোনো নড়চড় হবে না তা ওই মুখেই স্পষ্ট লেখা। কিন্তু তারও জেদ কম নয়। স্ত্রী এতবড় রেষারেষিতে নামতে পেরেছে যখন, তখন সেও এর শেষ দেখে ছাড়বে। অকরুণ জেদে প্রতাপ বোসও ঘর ভাঙার খেলায় মেতেছে।

নন্দিতাকে হস্টেলে রেখে এসে শমিতা বোস আর ও বাড়িতে

ঢোকেনি, সোজা হোলি-গার্ডেন-এ গিয়ে উঠেছে। হারান ভট্টাচায আর মোহন অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু শমিতা বোসের এক কথা, সে পাশে থাকা সত্ত্বেও মানুষটা যখন এতদূর বদলাতে পেরেছে, তখন এ ব্যাপারে তার নিজের দায়ও কিছু কম নয়। শুধু লোকটাকে ফেরানোর জন্যেই তার এ ভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসা। হারানবাবু বা মোহন যেন অন্তত সেই চেষ্টা করার সুযোগটুকুতে বাধা না দেয়।

তারপর মোহনের কাকুতি-মিনতি আর হারান ভট্টাচার্যের একান্ত অনুরোধে রমেন চৌধুরীর এই বাড়িতে এসে থাকা। যা নিয়ে নিজের সব চেয়ে আপনার জনের সঙ্গে চূড়ান্ত বিরোধ, সেখানেই শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজা। গ্লানিতে রাতের পর রাত ঘুম হত না। পরে ভেবেছে, এ এক রকম ঠিকই হয়েছে। যাতনা না থাকলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না। আজও নিঃশব্দে স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে শমিতা বোস। প্রত্যেক দিন আশা করে চলেছে, এবার হয়তো মানুষটা তার ভুল বুঝতে পারিবে, এবার হয়তো ফিরবে। কিন্তু সে আশা দুরাশাই রয়ে গেছে এপর্যন্ত। এখন শেষ ভরসা নন্দিতা। এই জন্যই চেয়েছিল ও ল পড়ুক, দরকার হলে নিজের বাবার সঙ্গে যাতে লড়াইটুকু অন্তত করতে পারে।

···আর আজ নন্দিতা এই লড়াই করে উঠল!

ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণা নন্দিতাকে একসময় ঠেলে তুলল। সদ্য ভোর হয়েছে, বড় রাস্তা থেকে প্রথম ট্রাম চলার শব্দ কানে আসছে, নন্দিতা নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একটা ট্যাক্সি ধরল।

'হোলি-গার্ডেন'-এ বরাবরই রাত থাকতে ভোর হয়। হারান

ভট্‌চায সামনের বাগানেই ছিল। নন্দিতাকে দেখে এগিয়ে এল, মুখে হাসি, এসেছিস? আমি জানতাম তুই আসবি। তুই যে কত ভাল মা আমার, তা তুই নিজেই জানিস না।

গ্লানিতে ধিক্কারে নন্দিতার ভেতরটা ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু বাইরেটা খরখরে শুকনো, দুচোখে জ্বালা। অস্ফুটে জিগ্যেস করল, মোহন কোথায়?

ওর ঘরে, ডাকব?

না, আমিই যাচ্ছি। তোমাদের এখানে এতে কোনো বাধা নেই তো?

বাধা কিসের? ডানদিকের একেবারে শেষের ঘরটাই ওর, যা না।

নন্দিতা পায়ে পায়ে সেদিকে এগুলো। তারপর আধ ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ধবধবে সাদা আসনের ওর স্থির নিশ্চল শিখার মত বসে আছে মোহন। মেরুদণ্ড টান, দুচোখ বোজা, বাঁ চোখের নিচে কালচে নীল দাগ ঘন হয়ে ফুটে উঠেছে। ধ্যানের মুদ্রায় দুহাত দুই হাঁটুর ওপর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যায় না। ঘরে পুজোর কোনো উপকরণ নেই বা ঠাকুর-দেবতার একটা ছবিও নেই। সামনের দেওয়ালে শুধু প্লাস্টার অব প্যারিসের ওঁ লেখা। চন্দন রঙের। জানালা দিয়ে, সূর্যের প্রথম আলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত শরীর জুড়ে সেই আভা।

পায়ে পায়ে নন্দিতা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কে যেন ওকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। হাঁটু মুড়ে দেয়াল-জোড়া বিশাল ওঁ-কারের সামনে বসিয়ে দিল। দুটো হাত কখন আপনা থেকেই জোড় হয়ে বুকের কাছে উঠে এল। তারপর সমস্ত শরীর পাশের ওই নিশ্চল মূর্তির পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল। ···যে অবরুদ্ধ কান্না দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাল রাত থেকে মাথা কুটছিল, এতক্ষণে তা মুক্তির পথ পেল। অব্যক্ত আবেগে সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল, সত্তা নিংড়নো চোখের জলে মাটি ভিজতে লাগল।

কিছুক্ষণ, বোধহয় অনেকক্ষণ। পিঠে হাতের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে মুখ তুলল। মোহন ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। শান্ত কমনীয় মুখ। অদ্ভুত মায়াভরা চোখ। চোখের নিচে গাঢ় নীল আঘাতের দাগ সত্ত্বেও আশ্চর্য রকমের প্রসন্ন। রাগ ক্ষোভ অপমান কিছুই যেন স্পর্শ করতে পারেনি।

নন্দিতা সোজা হয়ে বসল, চোখে গালে জলের দাগ। বলল, ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি তার আর দরকার নেই, ক্ষমা পেয়ে গেছি।

মোহন তেমনি চেয়ে আছে, হাসছে।

নন্দিতা ওর চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। মনে হচ্ছে ওই কালচে কাটা দাগটা ওরই বুকের তলায় খচখচ করে বিঁধছে। অস্ফুট স্বরে বলল, এত ক্ষমা জানো, তবু আক্কেল দাও কেন —ওখানে কিছু লাগাওনি?

লজ্জায় নন্দিতা তাকাতে পারছে না। মানুষের হাসি যে এত সুন্দর হয় তাও কি কখনো দেখেছে? মোহন ওকে নিশ্চিন্ত করার মত করে বলল, কাকু ডেটল-তুলো দিয়ে মুছে-টুছে দিয়েছে। ও জন্যে একটুও ব্যস্ত হয়ো না, এই দাগটুকুর দৌলতে কতখানি আমি পেলাম সেটা দেখছ না?

হাসছে সেইরকমই। আবার বলল, এত সকালে এসে গেছ, মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত রাত ঘুমোওনি?

ভেতরের আবেশ আবারও কান্না হয়ে ঠেলে উঠেছে। নন্দিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, এখন আমি কি করব বলে দাও।

মোহন অবাক একটু, তুমি কি করবে মানে? তোমার কি করার আছে?

বাবার এই অন্যায়ের বোঝা কোথায় রাখব? এমন গ্লানির ভার এর পরেও আমি টেনে যাব? তোমরা কার ওপর এত নির্ভর কর? কার কাছ থেকে এত জোর পাও? এতবড় লজ্জা মুছে দিতে পারে এমন কেউ কি সত্যি আছে?

মোহন হাসল। কিছু একটা শক্তি আছে—এই বিশ্বাস থেকেই যেটুকু জোর পাবার তা পাই, কিন্তু কোথায় আছে তা যদি জানতাম তাহলে আর এত যুদ্ধ করে মরছি কেন?

এটুকু বলার মধ্যেও অদ্ভুত আকুতি লক্ষ্য করল নন্দিতা।

একটু থেমে মোহন আবার বলল, যাক, তুমি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ, যা হওয়ার তাই হয়েছে। তাই হয়। এ জন্যে তুমি নিজেকে একটুও দায়ী কোর না। বিশ্বাস করতে পার তোমার ওপরেও আমার এতটুকু অভিযোগ নেই।

ঈষৎ তপ্ত স্বরে নন্দিতা বলল, কিন্তু আমি এত মহৎ হব কি করে? আজ যদি আমার অবস্থায় তুমি পড়তে, কি করতে?

এবারে মোহন একটু শব্দ করেই হেসে উঠল। বলল, সেই আমি আমি আমি—কি করে তোমাকে বোঝাব এই আমিটারই অন্য নাম অহংকার, এই অহংকার সর্বদা নিজেকে কর্তা সাজায়, কিন্তু আসলে যা হওয়ার তাই শুধু হয়।···যেমন ধরো, নিজের বাঁ চোখের নিচে কালচে ক্ষতটার ওপর আঙুল রাখল, তোমার হাত দিয়ে এই দাগটা এখানে পড়ার কথা ছিল বলেই পড়েছে, কিন্তু কেন যে পড়ার কথা তা তুমিও জানো না আমিও জানি না। এতে আমাদের কারুরই কোনো দায় নেই।

এই প্রথম নন্দিতার ঠোঁটে একটু হাসি এসেছে, বাঃ, তাহলে তো খুনীও নিষ্পাপ, নিরপরাধ।

মুচকি হেসে মোহন জবাব দিল, এক হিসেবে তাই। কিন্তু এই গবেষণায় ঢুকলে আমার মত তোমার মাথাটাও যাবে। আঙুল তুলে নিজের মাথা দেখাল, হারানকাকু রসদ জুগিয়ে জুগিয়ে এটির বারোটা বাজিয়েছে।

নন্দিতার হাল্কা লাগছে, যন্ত্রণাও কমছে। এই হারানকাকা আর মা-কে নিয়ে কত সময় কত কি-না ভেবেছে!

ওকে অবাক করে মোহন বলল, হারানকাকুকে চেষ্টা করলেও কেউ দুঃখ দিতে পারবে না, কিন্তু তোমার মায়ের মনে কত কষ্ট

জান না।···শী ইজ এ জেম অফ এ মাদার।···সব যখন বুঝেছ এবার তাঁর দিকে তাকাও, আমাদের নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

নন্দিতা একটু হেসেই বলল, আমি হারানকাকু আর মায়ের কথাই ভাবছিলাম। তোমাদের এখানে কি থট-রিডিংও শেখানো হয় নাকি ?

মোহন হেসে জবাব দিল, না, আমাদের এখানে থট-ডেভলপিং শেখানো হয়। মাটির আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—এবার তুমি বাড়ি যাও, নয়তো হারানকাকুর কাছে যাও, আমার সকালের অনেক কাজ বাকি—

আগে কেউ এভাবে চলে যেতে বললে ধাক্কা খেত, রাগ হত, কিন্তু আজ নন্দিতা গায়ে মাখল না। বলল, বাঃ, আমার যে অনেক কিছু অলোচনার দরকার ছিল, একটু বসো না, কি এমন কাজ যে ইচ্ছে করলে একদিন না করে পার না—?

মোহন মাথা নাড়ল, বলল, রুল ইজ রুল, ইচ্ছে করলেই কি একদিন সূর্য না উঠে পারে ?

নন্দিতার জগৎ এরপরে দ্রুত বদলাতে লাগল। ফাঁক পেলেই 'হোলি-গার্ডেন'-এ যায়। হারানকাকা, মোহন, ওখানকার আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে গল্প করে। মাঝে মাঝে মিহিরকেও ধরে নিয়ে যায়। মিহির ওর এই পরিবর্তনে ঠাট্টা করে। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম···বলে সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াতে গিয়েও পারে না, আসলে ওটুকুর বেশি জানেই না। তখন মোহনই সেটা পুরো করে দেয়, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা। অর্থাৎ মেয়েদের মনের হদিশ দেবতারাও পায় না, মানুষ তো কোন ছার!

একটা ভরপুর খুশিতে নন্দিতার দিন কাটছে। এই স্বাদ এক মাস আগে পর্যন্তও জানা ছিল না। শুধু একটাই কারণে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা। বাবা যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার উপশম কি করে

হবে, কি করলে হবে ভেবে পায় না। সেই রাতের ঘটনার দিন-তিনেকের মধ্যেই প্রতাপ বোস তার বাড়ি ফিরে গেছে। নন্দিতা খুব চেষ্টা করে সে কটা দিন তার সামনে সহজ থেকেছে। কিন্তু তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ, মেয়ের যে তাকে নিয়েই কিছু একটা হয়েছে, ঠিক বুঝতে পেরেছে। এরপর নন্দিতা নিয়মিত অফিসে যায়, বাবার সঙ্গে কথাবার্তাও বলে, কিন্তু আগের মত হতে পারে না। এর জন্য নিজেরই সবথেকে কষ্ট। এখনো ও বাবাকেই সবচেয়ে ভালবাসে। কিন্তু অতি প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলে মানুষ যতটা রক্তাক্ত হয়, ততটা আর কিছুতে না। প্রতিটা মুহূর্ত নন্দিতা সেই আঘাতের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। এ নিয়ে কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারছে না বলে আরও কষ্ট। মায়ের সঙ্গে এতদিনের একটা ঠাণ্ডা দূরত্বের ফলে নন্দিতা তার কাছে গিয়েও বুকটা হাল্কা করতে পারছে না। হারানকাকুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার চিন্তাটাই ওর কাছে লজ্জার। আর মিহিরকে তো কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র বলতে পারে মোহনকে। ওকে নিয়েই যখন ঘটনা, তখন ওর সঙ্গেই এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে, শেষ পর্যন্ত কি ফয়সালা হবে তা ঠিক করতে হবে। বাবাকে নন্দিতা এতবড় অন্যায় করে যেতে দেবে না। মোহন যতই বলুক, যা হবার তাই হয়েছে, নন্দিতা সেটা কিছুতেই মানতে পারবে না। এ কদিন ও অনেক ভেবেছে। বাবা কখনোই মানুষ খারাপ না, এত লোভীও সে হতে পারে না। হারানকাকুকেই আসলে বাবার বুঝতে ভুল হয়েছে। হারানকাকার 'হোলি-গার্ডেন' বাবার মনে কোনো দিনই ঠাঁই পায়নি এটা ঠিক। মোহনের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে বাবা শুধু হারানকাকার আর তার 'হোলি-গার্ডেন-'এর স্বার্থটাই দেখেছে। এর ওপর মায়ের অবিশ্বাস দেখেও হয়তো তার গোঁ বেড়েছে। তবে বাবা সত্যিই কিছুটা না বদলালে মা তাকে অবিশ্বাস করতে যাবে কেন? মায়ের মুখেই তো নন্দিতা শুনেছে কাজ আর টাকা, টাকা আর কাজের পাগল-করা নেশায় বাবা

দিনের পর দিন ডুবে থাকত। এমনি নানারকম ভাবতে গিয়ে নন্দিতার এক সময় মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাবাকে নিয়ে ওর যে একান্ত নিজস্ব একটা জগৎ ছিল তা চুরমার হয়ে গেছে। তবু সংকল্প, যে করে হোক, আবার সেটা গড়ে তুলবে।

কিন্তু মোহন এ নিয়ে কোনো কথাই বলতে বা শুনতে রাজি না। শুধু হাসে। কখনো বা মিহিরকে বলে, বেশ তো ছিলাম এতদিন, দিলে তো আমার পিছনে লেলিয়ে? মেয়েদের রাগঝাল বরং সয়, কিন্তু তাদের হঠাৎ অনুরাগ বড় ডেঞ্জারাস।

মিহির বলে, আমি লেলিয়ে দিলাম? ওর এই অনুরাগ দেখে আমার বুকের ধপধপানি তুমি শুনতে পাও না?

বাইরে কোনো কাজ না থাকলে মোহন সাধারণত দুপুরের দিকে নিজের ঘরেই থাকে। নন্দিতা যখন-তখন সেখানে গিয়ে হানা দেয়। মোহন একদিন হাসি মুখেই বলল, ব্যাচেলার ছেলেদের ঘরে আসতে হলে বাইরে থেকে জানান দিতে হয় জানো না?

নন্দিতার সেদিনের কথাটাই যে ওকে ফিরিয়ে দিল সেটা বুঝেই ও-ও খোঁচা দিতে ছাড়ল না। বলল, তুমি তো প্রায় মুনিঋষিদের সমগোত্রীয়, তোমাকে আমার জানান দেবার দরকার কি?

মোহন ছদ্ম-ত্রাসে আঁতকে উঠেছে, ও বাবা! মুনিঋষিদের কথা আর বোল না। যা চিজ এক একটি!

নন্দিতা অবাক, কেন? তারা আবার কি করেছে?

কি করেনি বল? অতবড় মুনি বিশ্বামিত্র, অপ্সরা মেনকাকে স্নান করতে দেখে তার সব জপতপ মাথায় উঠল।...এ গল্প তুমি জানো না?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে, জানে না। তারপর হেসে বলেছে, এ তো হল একজন। যত বড় মুনিই হোক, মানুষ তো, দেবতা তো নয়!

মোহনের সিরিয়াস মুখ, তাহলে দু'একজন দেবতার কথাই বলি

এবার। ওনারা তো পরের বউ ধরে টানাটানি করার জন্য ফেমাস। স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি তার নিজের ভাইয়ের বউয়ের জন্যে পাগল। ফলে যে কান্ড করেছিল, ইংরেজিতে তাকে তোমরা বলতে পারো স্রেফ হার্টলেস রেপ।

নন্দিতার কান-মুখ লাল হলেও ল পাশ করা মেয়ের মতই ত্রুটি ধরল, বলল, রেপ আবার হার্টলেস ছাড়া অন্যরকম হয় নাকি?

কি লোককেই না আল্‌ঠেছে! সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে মোহন সবিনয়ে বলল, স্বীকার করছি কাম-কলা সম্পর্কে এ অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে এসে স্বয়ং শঙ্করাচার্য মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর কাছে সাময়িক হার মেনেছিল। তারপর এক মৃত রাজার দেহে ঢুকে তার রানীর সঙ্গে বিহার করে যে জ্ঞান অর্জন করেছিল সেটা কোন ধরনের রেপ তা আলোচনা করতে রাজি আছ?

মুখ লাল করে নন্দিতা বলে উঠল, খুব হয়েছে, আর আলোচনায় কাজ নেই।

কিন্তু মোহন নির্বিকার—কেন লজ্জা করছে? তাহলে দেবতাদের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। দেবগুরু বৃহস্পতির তারপর কি নাজেহাল দশা শোন। টিট ফর ট্যাট নিশ্চয় জানো? বৃহস্পতির এরপর সেই দশা। তার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী তারার ওপর চোখ পড়ল আমাদের চাঁদমামার, চন্দ্রের। চাঁদ তো টানতে টানতে তারাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চুটিয়ে ফুর্তিফার্তা করল। এ নিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তুমুল মারামারি। তারপর ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় বৃহস্পতি যখন বউ ফিরে পেল, তখন সে আবার প্রেগন্যান্ট। তারা নিজেই স্বীকার করল, বাচ্চাটা চন্দ্রের। তখন বৃহস্পতির হুকুম, তুমি একলা আসবে, কিন্তু বাচ্চা আনতে পারবে না। নিরুপায় তারা সময় হওয়ার আগেই একটা পাহাড়ের ওপর বাচ্চাটাকে জোর করে জন্ম দিয়ে সেটাকে সেখানেই ফেলে স্বামীর

কাছে ফিরে এলো। ওই বাচ্চাই গ্রহাধিপতি বুধ। এসব কারণেই মুনিঋষি বা দেবদেবীদের আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

বলার ছিরিতে নন্দিতা লজ্জা পেলেও শুনতে দারুণ মজা লেগেছে। কানে আঙুল দেবার মত কথাও মোহন এমন অবলীলায় বলে যায় যে না হেসে পারা যায় না। ঠাকুর-দেবতা পুজো-আচ্চা বা ধর্মকর্মের ধার দিয়েও যায় না, অথচ এসব ব্যাপারের যাবতীয় তথ্য ঠোঁটের ডগায় মজুত। নন্দিতা একদিন জিগ্যেস করেছে, তোমাদের এখানে কোনো ঠাকুরদেবতার মূর্তি বা কোনো রকম পুজোটুজো দেখি না তো?

মোহন অবাক। সেসবের সঙ্গে এখানকার কি সম্পর্ক?

বা রে, সব আশ্রমেই তো এসব হয়!

এটা আশ্রম তোমাকে কে বলেছে?

তাহলে এটা কি?

এটা 'হোলি-গার্ডেন'—পবিত্র বাগান, এখানে মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করা হয়, যেটা সবথেকে ডিফিকাল্ট এখন।

তাহলে তুমি রোজ সকালে কার ধ্যান কর? কেন কর?

—করি স্রেফ নিজের স্বার্থে। যোগব্যায়ামে যেমন শরীর তৈরি হয়, কনসেনট্রেশনেও তেমনি মন তৈরি হয়। নিজের ভেতরটা দেখার জন্যেই ধ্যান করি। আর কার ধ্যান যে করি তা যদি জানতাম তাহলে আমারও সেই পাঁচিলের ওধারে মুখ থুবড়ে পড়া লোকগুলোর দশা হত।

শেষের কথাগুলো নন্দিতা এক বর্ণও বুঝল না। তার মানে? কি বলছ? কাদের কথা বলছ?

মোহনের ছদ্ম-বিরক্তি, নাঃ, তুমি দেখছি কিছুই জান না। শোন তাহলে। ক'জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক করল ব্রহ্ম কি তা দেখবে। ব্রহ্মের আর তাদের মাঝখানে একটা বিরাট পাঁচিল ছিল। সেটা টপকাতে পারলেই ব্রহ্মের স্বরূপ দেখা যাবে। ব্রহ্ম আজ অবধি উচ্ছিষ্ট হয়নি জান তো? কারণ কেউ তার স্বরূপ জানে না। আর

তার ফলে কেউ তাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, অর্থাৎ বাক্ বা জিভ দিয়ে এঁটো করতে পারেনি। তা সেই সিদ্ধপুরুষরা ঠিক করল, তারা এই পবিত্র কর্মটি করবে। একজন একজন করে পাঁচিল বেয়ে উঠতে লাগল। শেষে যেই না একজন পুরোপুরি ব্রহ্মকে দেখতে পেয়েছে, অমনি ধপ করে পাঁচিলের ওধারে সেই যে পড়ল আর উঠলই না। তার পরের জনেরও একই দশা, তার পরেরটিও। এভাবে এক এক করে সবাই মুখ থুবড়ে পড়ল। একেবারে শেষে যে ছিল, সে ব্রহ্মের পয়েন্ট এক পার্সেন্ট দেখা মাত্র কে যেন তাকে পাঁচিলের এধারেই আবার ঠেলে দিল। লোকহিতের জন্যে তার পৃথিবীতে থাকা দরকার। যেটুকু দেখেছে সেটুকু জগতের কাছে পেঁছুতে পারলেই মানুষের মোক্ষ লাভ।

নন্দিতা উদগ্রীব, আর যারা পাঁচিলের ওধারে পড়ল? তাদের কি হল?

তারা ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে গেল। পূর্ণব্রহ্ম দর্শন হলে আর কি দেহে থাকা যায়, না দেহ ধরে রাখা যায়?

নন্দিতা চেয়ে চেয়ে মোহনকেই দেখছে। তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে?

কোত্থেকে আবার, বই পড়ে! হেসে বলল, আমি তো স্বীকারই করি আমি মুখ্যু, তোমাদের মত ঝরঝর ইংরেজি বলতে পারি না, বা ক্লাসিক ছাড়া বিদেশী সাহিত্যও পড়ি না। কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়, কারণ তোমরা হলে আরও বড় মুখ্যু। নিজের ঘরে কত সম্পদ, কিন্তু নিজেরাই তার খোঁজ রাখ না। আমাদের বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবত-হরিবংশ, এগুলো কখনো উল্টে দেখেছ?

আজকাল মোহনের সব কথা শুনতেই নন্দিতার খুব ভাল লাগে। সরাসরি ওকে মুখ্যু বলাতে রাগ তো হয়ইনি বরং মনে হয়েছে ঠিকই বলেছে।

ভেতরে ভেতরে কখন একটা আমূল পরিবর্তনের পালা শুধু হয়েছে নন্দিতা নিজেই জানে না। মিহিরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও আজকাল প্রায়ই ভুল হয়ে যায়, মোহনের সঙ্গে কথা বলার জন্য ভেতরটা উদগ্রীব হয়ে থাকে। ফাঁক পেলেই মোহনকে এদিক ওদিক ধরে নিয়ে যায়। মোহন আপত্তি করে না, কিন্তু হেসেই ওকে সতর্ক করতে চেষ্টা করে।—তোমার সঙ্গে গল্প করতে বা বেড়াতে আমার ভালই লাগে, কিন্তু নিজের মনের দিকে তাকিয়ে ঠিকঠাক বল তো, মিহিরের ওপর কোনোরকম অবিচার করছ না?

নন্দিতার মুখ লাল। সবেগে মাথা নেড়েছে, কক্ষণো না। হি ইজ মাই লাভ অ্যান্ড ইউ আর মাই ফ্রেন্ড।

মোহনের মুখে দুষ্টু হাসি। ও, ফ্রেন্ডকে তা হলে ভালবাসা যায় না, আর যাকে ভালবাসা যায় সে ফ্রেন্ড হতে পারে না?

নন্দিতা হেসে ফেলেছে, উঃ! এত লজিক শিখলে কোথা থেকে? গীতা-ভাগবত পড়ে?

মোহন হেসে হেসে মাথা নাড়ল, গীতা-ভাগবতে তর্ক কোথায়? শুধু বিশ্বাস আর ভক্তি সার—

নন্দিতা ঠাট্টা করল, তা তোমার ভক্তি কার ওপর?

তোমার ওপর, আমার ওপর, তোমার গাড়িব ড্রাইভারটার ওপর, ওই গরুটার ওপর—সব্বার ওপর। সব মিলিয়ে আর সক্কলকে নিয়েই না কি তিনি!

এই তিনিটি আবার কে?

এই তিনিটি যে কে সেটা জানার জন্যেই তো সিদ্ধ-পুরুষদের ওই দশা, সেই যে পাঁচিলের ওদিকে মুখ থুবড়ে পড়ল, এদিকে আর উঠলোই না।···এই তিনিটি কে তা জানতে পারলে আমিই কি আর এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতাম? কবেই বেমালুম লোপাট হয়ে যেতাম।

বাড়িতে মায়ের সঙ্গে নন্দিতার খুব একটা কথা হয় না। শমিতা বোস কাজে ব্যস্ত। কলকাতার বাইরে মস্ত সাহিত্য অধিবেশনের

তরফ থেকে ডাক পড়েছে। কথা-সাহিত্যের ক্রম-ধারা নিয়ে তাকে বলতে হবে।

তাই পড়াশুনো নিয়ে ডুবে আছে। আলোচনা একটু আধটু শুধু হারান ভট্টাচার্যের সঙ্গে করে। তার সাহায্য নিয়েই মূল ভাষণ লেখা শুরু করবে। এই মা-কেই নন্দিতার এখন কত ভাল লাগে। ব্যস্ততার মধ্যেও মা মাঝে মাঝে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এই দেখাটুকুর মধ্যে এখন কত যে নির্ভরতা নন্দিতা তা অনুভব করতে পারে। ওকে নিজের ব্যথার ভাগ দিতে পেরে মা যেন অনেক হাল্কা হতে পেরেছে। কিন্তু নন্দিতা ভেবে পায় না ও কি করবে এখন, কিভাবে ফয়সালার দিকে এগোবে। যার সাহায্য পেলে কিছু একটা ঠিক করতে পারত, সেই মোহন চৌধুরীর কাছে তার বিষয়-সম্পত্তির কথা তুলতে গেলেই দু'হাত তুলে ওকে থামিয়ে দেয়। নয়তো দশ রকমের কথা শুরু করে দেয়।

শমিতা বসু যথা সময় সাহিত্য সভায় যোগ দিতে চলে গেল। তারপর দিন দশ-বারো ধরে উত্তর ভারতের কয়েকটা জায়গা দেখে ফিরবে ঠিক হয়েছে। মা চলে যেতে নন্দিতা বাড়িতে একেবারে একলা। আগে হলে মন টিকত না। মিহিরকে তলব করত, নয়তো ছোট মাসি কিম্বা বাবার কাছে গিয়ে থাকত। কিন্তু এখন চুপচাপ একলা দিন কাটাতেই ভাল লাগে। ওর ভেতর-বার সবই এখন অনেক শান্ত।

বিকেলের দিকে রোজই নন্দিতার ভেতরটা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। গাড়ি নিয়ে 'হোলি-গার্ডেন'-এ চলে যায়। মোহনকে তুলে এক একদিন এক এক দিকে।

সেদিন গঙ্গারঘাটে যেতে নৌকোওলারা ওদের ছেঁকে ধরল। নন্দিতা মোহনকে জিগ্যেস করল, যাবে নাকি?

পর ইচ্ছে বুঝেই মোহন বলল, যেতে পারি।

নৌকো ভাড়া করে ওরা উঠতে গেছে, এমন সময় বিপত্তি। পিছল কাদার ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে মোহন আগে

উঠেছে, তার পিছন পিছন নন্দিতাও। কিন্তু গোল বাধল একটা পা নৌকোতে রেখে দ্বিতীয় পা ফেলার সময়। পাটাতনের ফাঁকের মধ্যে পা-টা ঢুকে গিয়ে নন্দিতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মোহন তাড়াতাড়ি ওকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফাঁক থেকে পা টেনে বার করাই যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় নন্দিতার মুখ নীল, মোহনের টানাটানিতেও দাঁড়াতে পারছে না। মাঝিটাও এগিয়ে এসেছে। দুজনে মিলে কোনো রকমে টেনে পা-টা বের করল কিন্তু দাঁড় করাতে পারল না। গা গুলিয়ে বমি পেতে নন্দিতা দাঁতে দাঁত টিপে চোখ বুজে রইল।···ওর অবস্থা বুঝেই মোহন দাঁড় করানোর চেষ্টা ছেড়ে মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে সোজা পাঁজাকোলা করে দুহাতে তুলে নিল। মাঝির সাহায্যে সাবধানে নৌকো থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে শক্ত জমিতে উঠে এলো। তারপর লোকের উৎসুক চাউনির ওপর দিয়ে সোজা গাড়িতে।

ব্যথায় নন্দিতা চোখে অন্ধকার দেখছে।

বাড়িতে ফিরেও মোহন ওকে পাঁজাকোলা করে নামাল। দৃশ্য দেখে কাজের লোক দুটো হকচকিয়ে দৌড়ে এলো। মোহন সোজা দোতলায় ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। পা-টা এরই মধ্যে বিষম ফুলে উঠেছে। হাড় ভেঙেছে কিনা মোহনের সেই চিন্তা। ছোট মেসোকে ফোন করল, কিন্তু সে বাড়ি নেই। রবিবার তাই অন্য কোনো ডাক্তারও পেল না। কাজের মেয়েটাকে চুন-হলুদ গরম করতে বলে আর ড্রাইভারকে ব্যথা কমার ট্যাবলেট আনতে দিয়ে আবার নন্দিতার কাছে এসে বসল। উতলা মুখে ওকেই জিগ্যেস করল, রোববার বলে কোনো ডাক্তার পেলাম না, তোমার মাসি-মেসোও বাড়ি নেই, কি করি বলো তো? তোমার বাবা আর মিহিরকে খবর দিই?

ব্যথা সত্ত্বেও নন্দিতা মোহনকেই চেয়ে চেয়ে দেখছে। অসুখ করলে বাবা-মায়ের চিন্তা দেখেছে, তা নিয়ে কখনো কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আজ ওর জন্যে এই একজনের চিন্তার স্বাদ

সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে লাগল। যন্ত্রণা খুব, কিন্তু ব্যথায় এত সুখ তা কি কখনো জানতো? বলল, বাবা বা মিহির এসে কি করবে, তারা কি ডাক্তার?

তাহলে আমিই বা শুধু বসে থেকে কি করব, আমি কি ডাক্তার?

নন্দিতার নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা, বসে থেকো না তাহলে।

কাজের মেয়েটা গরম চুন-হলুদের বাটি আর ড্রাইভার ওষুধ নিয়ে ঘরে ঢুকতে মোহন কি বলতে গিয়েও থেমে গেল। ওদের হাত থেকে সেগুলো নিয়ে বলল, কাছাকাছি থেকো, দরকার হলে ডাকব। ওরা চলে যেতে নন্দিতাকে আগে ওষুধটা খাওয়াল, তারপর বসে বসে ব্যথার জায়গাতে চুন-হলুদের প্রলেপ দিতে লাগল। পায়ে হাত দিতে নন্দিতা সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে হেসে বলল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন, দেহি পদপল্লবমুদারম্ —আমি তো কোন ছার!

নন্দিতা লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু ভেতরটা ভরেও যাচ্ছে।

পরদিনই বাড়িতে এক্স-রে করে দেখা গেল হাড় ভাঙেনি, ভাল রকম মচকে গেছে। এরপর নন্দিতা বেশ কিছুদিন বিছানায়। বাবা, মিহির, হারানকাকু, ছোট মাসি-মেসো রোজ আসে। কিন্তু মোহন যদি একদিনও কোন কাজে আটকা পড়ে যায়, সেদিন আর সকলের আসাটা নন্দিতার বিস্বাদ লাগে।

আর কেউ না হলেও মিহির সেটা বুঝতে পেরেছিল।

নন্দিতা মোটামুটি সেরে উঠলেও সিঁড়ি ভাঙতে গেলে পায়ে এখনও খচখচ করে লাগে। নিজে আগের মত যখন-তখন যেতে পারে না বলে মোহনকেই গাড়ি পাঠিয়ে ধরে আনে। ওর জোর তলবে সেদিন মোহন এসে ডিভানে বসতে নন্দিতা কিছু খেয়াল না করে প্রায় ওর গা ঘেঁষে বসে কি একটা বলতে যেতেই মোহন নড়েচড়ে একটু সরে বসল।

নন্দিতা মনে মনে অপ্রস্তুত হলেও মুখে ঠাট্টা করতে ছাড়ল

না।—এঃ! আর একটু হলেই জাত যেত, তোমাদের যে কামিনী কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যজ্য ভুলেই গেছলাম।

মোহন হেসে উঠল, এ আবার তোমায় কে বলল? তাছাড়া কাঞ্চন পেলে তবে তো ত্যাগের প্রশ্ন! আর কামিনীই বা এল কোত্থেকে?

আসেনি? আমি তবে কি? অবশ্য জাত তোমার চলেই গেছে···

জাত গেছে মানে?

মানে, মেয়েদের ছুঁলেই তো তোমাদের মহাপুরুষদের জাত যায়। সেদিন নৌকোর ওই অ্যাকসিডেন্টের ফলে ছোঁয়া! সাধকদের কাছে একেবারে'বিচ্ছিরি রকমের ছোঁয়া—

—আমি সাধক নই। তাছাড়া ওই বিপদের সময় তুমি মেয়ে কি ছেলে, আমার খেয়াল ছিল? মোহনের সাফ জবাব।

নন্দিতা তড়পে উঠল, দেখ, নিজেকে ঠকিও না, তুমি ঘেমে উঠেছিলে, চোখ বুজে থাকলেও আমি কি তখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?

মোহন হাসতে লাগল! বলল, চোখ খুলে থেকেও তুমি এখনো অজ্ঞান। একটা গল্প শোন তবে।··· মহামুনি ব্যাসদেবের নাম শুনেছ তো? সেই ব্যাসদেব একদিন দিব্য চোখে দেখল, তার ছেলে শুকদেব এক দীঘির পাশ ধরে যাচ্ছে, আর অপরূপ সুন্দরী সব অপ্সরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সেখানে চান করছে। চির-তরুণ-দিব্যকান্তি শুকদেবকে দেখে তারা লজ্জা তো পেলেই না, বরং সে ভাবে থেকেই তার দিকে হাত তুলে সম্ভাষণ করল। শুকদেবও হাসি মুখে তাদের পাল্টা সম্ভাষণ জানিয়ে আর একদিকে চলে গেল। এদিকে ধ্যান ভেঙে ছেলের বিরহে কাতর ব্যাসদেব তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেই দীঘির ধারে যেই এসেছে, অমনি অপ্সরারা লজ্জায় একহাত জিভ কেটে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নিল। ব্যাসদেব তো অবাক! হাজার হাজার বছরের অতি বৃদ্ধকে দেখে তাদের

এই সংকোচ, অথচ তারই যুবক পুত্র শুকদেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একেবারে সহজ আচরণ করেছে। ব্যাসদেব এর কারণ জিগ্যেস না করে পারল না। জবাবে অপ্সরারা কি বলল জান? বলল, প্রভু! আপনি বৃদ্ধ হয়েও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ সম্পর্কে এখনো সচেতন। কিন্তু আপনার ছেলে বয়সে তরুণ হলেও তাঁর কাছে পুরুষ নারী বলে আলাদা কিছু নেই, তাঁর ভেদাভেদ জ্ঞান ঘুচে গেছে।

নন্দিতা কান পেতে শুনেছে। তারপর ঠাট্টা করেছে, তোমাকে এখন থেকে শুকদেব বলেই ডাকি তাহলে?

মোহন হাসল। তারপর বলল, আমাকে ডাকাডাকি ছেড়ে এখন মিহিরের দিকে একটু মন দাও।

নন্দিতা থতমত খেল। ঠাট্টার ছলে অনুযোগটা বুকের মধ্যে কোথাও গিয়ে বিঁধল।

নন্দিতা অস্বীকার করবে কি করে যে মিহিরের সঙ্গে একটা দূরত্ব আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে? অথচ ও নিজেও তা চায় না, মিহিরকে আগের মতই ভালবাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। এই না পারার জন্য মনে মনে কষ্ট পায়। যা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সেটা জোর করে করতে যাওয়ার যে ধকল তা চোখেমুখে ফুটে ওঠে। বুদ্ধিমান মিহির বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু সে সত্যিকারের স্পোর্টস-ম্যান, ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেলেও মুখে ঝিছু বলে না। নিজের সঙ্গে একটা এসপার ওসপার করার বাসনা নিয়েই নন্দিতা সেদিন মিহিরের বাড়ি গেল। কখন ওকে পাওয়া যায় তা ভাল করেই জানে।

মিহির নিজের ঘরে ছিল। নন্দিতাকে দেখে হাসল, কি ব্যাপার? আজ যে মেঘ না চাইতেই জল?

নন্দিতা ছদ্ম ঝাঁঝ দেখাতে চেষ্টা করল, কেন? আমি এখানে আসি না?

মিহিরের ঠোঁটে মজা পাওয়া দুষ্টু হাসি।—আগে আসতে, কিন্তু এখন বড় একটা আসো না।

বাজে বোক না। পা মচকালে আসব কি করে?

মিহিরের মুখে আবারও দুষ্টু হাসি, তাই তো! পা মচকালে গাড়িতে অফিস যাওয়া যায়, মাঝে মাঝে 'হোলি-গার্ডেন'-এ যাওয়া যায়, কিন্তু আমার বাড়ি যে বড্ড দূর, এরোপ্লেনে ছাড়া আসাই যায় না।

জবাবে নন্দিতা হেসে কি বলতে গিয়েও থমকে গেল। মিহির দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে।

ও এলে দরজা বন্ধ করা হতই। আর ও নিজেও সেই প্রতীক্ষায় থাকত। কিন্তু আজ নন্দিতার কেমন অস্বস্তি লাগছে। নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে উঠল। জিগ্যেস করল, মেসোমশাই কোথায়?

মিহির ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। ওর দুটো কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। ভারী মজার কিছু শুনল যেন, জোরে হেসে উঠল, মেসোমশাই? মানে বাবা? এ সময় আমাকে ছেড়ে হঠাৎ আমার বাবার চিন্তা? সে এখন কি করবে?

নন্দিতার মুখ লাল। আগে হলে ও-ও একটা পাল্টা রসিকতা করত। কিন্তু আজ পারল না। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই আর আগের মত সহজ হতে পারছে না। শুকনো মুখে বলল, না এমনি···

মিহির চোখে ঠোঁটে টিপটিপ হাসি নিয়ে নন্দিতাকেই দেখে যাচ্ছিল। এবার ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। নন্দিতা আড়ষ্ট, দু ঠোঁট শুকনো। মিহির আরও ঘন হয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই নন্দিতা ওকে ঠেলে সরাতে গেল, নিজের অজান্তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, না, না!

মিহির সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। ঠোঁটে এখনো সেই হাসি। উঠে দরজা খুলে দিল। তারপর নন্দিতার পাশে এসে বসল।

নন্দিতা মিহিরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। শুধু নিজের কাছেই নয়, মিহিরের কাছে ও ধরা পড়েই গেছে।

আমার দিকে তাকাও, মিহিরের গলা আশ্চর্য নরম।

নন্দিতা মুখ না তুলে পারল না। মিহিরের অদ্ভুত হাসি-ছোঁয়া মুখ। ঘোর বাদামী দুটো চোখ ভারী জীবন্ত অথচ শান্ত। বলল, তুমি যে আজকাল ইনডিসিশনে ভুগছ, তা তুমি নিজে স্পষ্ট করে না বুঝলেও আমি টের পেয়েছিলাম। তবু পুরোপুরি যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই আজ এরকম করেছি। যাক, এখন আমার একটাই অনুরোধ, জোর করে কিছু করতে চেষ্টা কোর না। যা নিজের থেকে হওয়ার তা-ই হোক। এটা যদি তোমার একটা সাময়িক ব্যাপার হয়ে থাকে তো আপনিই কেটে যাবে। আর তোমার আমার সম্পর্কটাই যদি সুপার-ফিসিয়াল হয়, তাহলে দ্য সুনার ইট এন্ডস্ দ্য বেটার, আপাতত লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি···

ঠেলে আসা কান্না সামলাতে নন্দিতা দু-হাতে নিজের মুখ ঢাকল।

ক'দিন এরপর বাড়ি থেকেই বেরল না। অফিস গেল না, 'হোলি-গার্ডেন'-এও না। মনের যন্ত্রণা নন্দিতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না, সারাক্ষণ শুধু চুপ করে নিজের ঘরে বসে থাকে।

শমিতা বোস কলকাতায় ফিরে মেয়ের এই চেহারা দেখে অবাক, কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ নাকি?

নন্দিতা হাসতে চেষ্টা করল।—পা মচকে গেছল, এখন ভাল আছি। তুমি কেমন কাটালে?

—সে পরে শুনিস। পা মচকেছে তো মুখে চোখে এরকম কালি পড়েছে কেন? খবর সব ভাল তো?

—ব্যস্ত হয়ো না, সবাই ভাল আছে।

কিন্তু মা এতটুকু আশ্বস্ত হতে পারল না। চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল।

দিন তিনেক পরে এক সন্ধ্যায় হারান ভট্‌চায সোজা ওর ঘরে এসে হাত রাখল, নানু-মা তোর কি হয়েছে আমাকে বল তো? ছেলেমেয়ে এরকম করে থাকলে বাপমায়ের যে কত কষ্ট হয় তা আজ বুঝতে পারবি না। তোর মা মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোর জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে. কি হয়েছে আমাকে বল।

আকুল কান্নায় নন্দিতা এবার হারানকাকুর কোলে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল।—কাকু, তুমি তো সবই বুঝতে পার। আমার জগৎটাই একেবারে পাল্টে গেছে। আমার যে আর কোনো পথই নেই। মিহিরকেও আমি নিজের দোষে হারাতে বসেছি।

হারান ভট্‌চায চুপ খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে নন্দিতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, এটা তুই ঠিক করিসনি নানু-মা। মোহনকে বোধহয় কোনোদিনই কেউ সেভাবে পাবে না। ও বরাবরই অন্য রকম—

মুখ তুলে নন্দিতা এবার একটু জোরেই বলে উঠল, কেন? ঘর-সংসারে থেকে বড় কাজ করা যায় না? তাছাড়া ওর বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই একটা কিছু ছুতোয় থামিয়ে দেয়। বাবার সবকিছুই আমার, আমিই বা এমনি এমনি ওর দয়ার দান নেব কেন? তাছাড়া আমার বাবার ভুলের প্রতিকার তো আমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্তত তুমি ওকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হুকুম কর।

হারান ভট্‌চায একটা বড় নিশ্বাস ফেলল।—বেশ, বলব, তুই যাতে ভাল থাকবি তা করতে নিশ্চয় চেষ্টা করব।

নন্দিতা উৎসাহে সোজা হয়ে উঠে বসল।—তুমি বললেই হবে। তোমার কথা মোহন কিছুতেই ফেলতে পারবে না। এরমধ্যে আমিও বাবার সঙ্গে এই নিয়ে ফয়সালা করব। বাবা যদি এমনি সব ছেড়ে দিতে রাজি না হয়, তাহলে আমি কোর্ট পর্যন্ত যাব। বাবার জন্যেই এটা আমাকে করতে হবে।

হারান ভট্‌চায চুপচাপ ওকে দেখল খানিক, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল। নন্দিতার মনে হল সে যেন নিঃশব্দে একটা ব্যথা চেপে উঠে গেল।

সেই সন্ধ্যাতেই নন্দিতা পুরনো বাড়ির দোতালায় উঠে সোজা প্রতাপ বসুর ঘরে ঢুকল।

প্রতাপ বোস একলা বসে ড্রিংক করছিল। নন্দিতাকে দেখে হাসল, আয়, কতদিন পরে এলি···

নন্দিতা বসল। হুইস্কির বোতলটা দেখিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার না এখন এসব ছোঁয়াও বারণ?

প্রতাপ বোস হাসল।—এত বারণ মেনে কি হবে?

নন্দিতার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। জোর করে নিজেকে শক্ত করল। বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা···

—সে আমি জানি। মিহির বাতিল তো?

নন্দিতা অসহিষ্ণু একটু, আমি সে ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি, আমি জানতে এসেছি মোহনের সবকিছু তুমি ফিরিয়ে দেবে কিনা?

প্রতাপ বোসের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, চওড়া চোয়াল এঁটে বসল।—যদি না দিই?

নন্দিতাও এই বাবারই মেয়ে। স্পষ্ট জবাব দিল, তাহলে প্রথমেই তোমার অফিস ছাড়ব। তারপর মোহনের উইল নিয়ে কোর্টে যাব। হেরে গেলেও বাবা-মেয়ের এই লড়াই প্রত্যেকটা কাগজ ফলাও করে ছাপবে!

প্রতাপ বোসের মুখে এবার মজা-পাওয়া হাসি।—তুই আমাকে ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখাচ্ছিস? দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তুই কোর্টেই যা। বাবার এগেন্‌স্ট কেস সাজিয়েই জীবনের প্রথম প্র্যাকটিস শুরু কর। উইশ ইউ এভরি সাকসেস। বড় করে গ্লাসে চুমুক দিল একটা। তার পরেই কঠিন আবার। ভারী গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল, ইউ ফুল! আবার তোকে তোর মা যা বুঝিয়েছে তুই ঠিক তাই বুঝেছিস। আমি একটা চিট, টাকার

লোভে বাপ-মা মরা ছেলেটার সবকিছু গ্রাস করেছি, না ?···নেভার। হোয়াট আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড ওয়াজ টু সেভ হিজ প্রপারটি ফ্রম হারান। আমি একবারও বলছি না হারান ইজ এ ব্যাডসোল, কিন্তু এই সাধু হবার নেশা ওকে খেয়েছে। থামল একটু, তারপর আবার বলল, আমি কখনোই ক্লেম করি না আমি খুব ভাল লোক বা আমার কোনো লোভ নেই, কিন্তু তোরা যদি ভেবে থাকিস টাকার নেশায় আমি মোহনকে চিট করেছি, তো জেনে রাখ মহাপুরুষ হওয়ার নেশায় হারান ওকে আরো বড় চিট্ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল। ওই প্রপার্টি হারান তার আশ্রমে ঢালতো। মোহনের কোনো রকম পার্সোনালিটি-ই ডেভলপ করেনি। হারানের হাতে ও একটা পুতুল মাত্র। আমি মাসে মাসে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, হারান অ্যাক্সেপ্ট করেনি, ওর দাবী—যা দেবার তা 'হোলি-গার্ডেনে'-এর জন্যে দিতে হবে। অ্যান্ড আই রিফিউজড্ টু ডু দ্যাট। তারপর থেকে ও তোর মাকে বিষিয়েছে, আস্তে আস্তে এমন অবস্থা করে তুলেছে যে শী আল্টিমেটলি লেফ্ট মি। সেন্টিমেন্টাল ফুল্স সব, বাস্তবের মাটি দিয়ে তো হাঁটে না! আমি এত খারাপ যে তোকে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সরানোর জন্যে হস্টেলে পাঠিয়েছে। প্রতাপ বোস সরোষে হাতের গ্লাসটা আবার মুখের কাছে এনেও নামিয়ে রেখে বলল, মোহনকে আমি আমার কাছে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিলাম, কিতু হারান দেয়নি। দেবে কেন? যে হাঁস ডিম পাড়বে তাকে কেউ ছাড়ে? হারান ভাল করে জানত মোহনের একুশ বছর বয়স হলে সবই তার ওই 'হোলি-গার্ডেন'-এই যাবে। ভাল ছেলেটাকে একেবারে অপদার্থ করে তুলেছে। একে কি মানুষ হওয়া বলে?

নন্দিতা বাধা দেবার মত করে বলল, বাবা, তুমি মস্ত ভুল করছ। মানুষ হওয়ার আদর্শ সকলের কাছে এক নয়। আর চাঁদা তুলে বেড়ানোটা আমিও এতদিন হেট করতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি অনেক কিছুরই একটা আলাদা অর্থ আছে।

প্রতাপ বোসের মুখে ব্যঙ্গ ঝরল, তাই নাকি? তুই বুঝে ফেলেছিস?

—হ্যাঁ ফেলেছি। মোহন ঠিক তোমার আমার লাইফ লিড করে না। তা বলে যদি মনে করো ও অমানুষ হয়েছে তাহলে বিরাট ভুল হবে। আমিও এই ভুলই করেছিলাম। আর চাঁদার ব্যাপারটা যদি ধরো, ওদের জীবনে ওটারও মস্ত ভ্যালু আছে, ওতে অহং নষ্ট হয়, ইগো যায়, আর কিছু গরীব লোকেরও উপকার হয়। ওদের কাছে এটা সেলফ্‌লেস্‌ এবিভেশনের একটা প্রোসেস।

—বাঃ বাঃ বাঃ! এমন জ্ঞানটা তোকে দিল কে? তোর মা, না হারান? না ওই মোহন নিজে?

নন্দিতা স্থির চোখে প্রতাপ বোসের দিকে চেয়ে বলল, বাবা, আমি যে ভুল করেছিলাম, তোমারও ঠিক সেই একই ভুল হচ্ছে। হারানকাকুকে তুমি যা ভেবেছ সে তা না। কোনো রকম বাহবা কুড়নোর নেশায় নয়, নিজের প্রাণের তাগিদেই সে এসব করে। নয়তো মোহনের বাবা যখন তাকেও একজন ট্রাস্টি করতে চেয়েছিল তখন সে রিফিউজ করেছিল কেন?

মহত্ব দেখানোর জন্যে, প্রতাপ বোস তেমনি অসহিষ্ণু, তুই কেন বুঝতে পারছিস না ও খুব ভাল করেই জানতো যে মোহনকে পেলেই ওর সব পাওয়া হবে। অবশ্য আমিও প্রথমে এটা ধরতে পারিনি, বরং ওর নির্লোভ মন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু পরে সব পরিষ্কার বুঝেছি। থামল একটু, আবারও গ্লাস তুলে বড় একটা চুমুক দিল, তারপর বলে গেল, দেখ, তোরা যতটা ভাবছিস আমি লোকটা তত খারাপ নই। মোহনকে আমি একা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম, কিন্তু সে আসে নি। হারান ওর মাথাটা এমন ভাবে খেয়েছে যে নিজের প্রপার্টির ব্যাপারে পর্যন্ত নিজে কথা বলার মুরোদ নেই। আমি তখন সোজা বলে দিয়েছি ওরা যেন কোর্টে গিয়ে এ ব্যাপারে

যা করার করে, আমি এক পয়সাও ছাড়ব না। বাপের রক্ত জল করা টাকা, সেটা ক্লেইম করার সাহস পর্যন্ত নেই। ও আবার মানুষ! তোর মা-ও দিনরাত এই এক ব্যাপার নিয়ে আমাকে খোঁচাতে লাগল। এক মাসের আল্‌টিমেটাম দিল। বাট আই অ্যাম নট হারান ভট্‌চায্‌, আই অ্যাম এ ম্যান! আমিও চুপ করে দেখছিলাম তোর মা কতদূর যেতে পারে। অ্যান্ড শী লেফ্‌ট মি। এখন তোকে সুদ্ধু আমার বিরুদ্ধে বিষিয়েছে। বাট স্টিল আই লাভ হার, স্টিল আই মিস হার, বাট আই ক্যান নট মুভ অ্যাকরডিং টু হার কম্যান্ড।

নন্দিতা বাবার দিকে চেয়েই আছে। পুরুষের রাগ, পুরুষের ক্ষোভ, পুরুষের আত্মাভিমানই বটে। কিন্তু সবটাই যে তারই বিরাট ভুল সেটা আর বোঝানো যাবে না, বুঝবে না। নিজে যা ধরে নিয়েছে তার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই করবে না। এই বাপেরই মেয়ে নন্দিতাও যে এতদিন ধরে ঠিক এমনই ছিল। তবু একটা শেষ চেষ্টা করল, মোহনের সম্পত্তি তুমি তাহলে ওকে ফিরিয়ে দেবে না?

প্রতাপ বোসের লালচে দুচোখ ওর মুখের ওপর থমকাল। কেন? তুই ওকে বিয়ে করবি? ও তোকে কথা দিয়েছে? তাহলে এত কচকচির কোনো দরকার নেই। ওকে আমার কাছে নিয়ে আয়, আজ পর্যন্ত ওর যা-যা প্রাপ্য সব কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেব।

নন্দিতা মাথা নাড়াল।—না এরকম কোনো কথাই হয়নি। প্রতাপ বোসের দুচোখ ঘোরাল হয়ে উঠল।—তাহলে? তোর মা আর হারান তোকে আমার এগেনসটে হাতিয়ার করেছে? তাদের বলে দিস, আমি একটা পাই-পয়সাও ছাড়ব না।

নন্দিতা আরও স্থির, আরও শান্ত। বলল, মা বা হারানকাকু এ ব্যাপারে আমাকে একটি কথাও বলেনি। আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি। মেয়ে হয়ে এতবড় ভুল আমি তোমাকে করতে দেব না। ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ এভরিথিং ব্যাক।

মেয়ের ছেলেমানুষি জিদ দেখে প্রতাপ বোস হঠাৎ মজাই পেল এবার।—হুঁ? আদারওয়াইজ ইউ উইল গো টু কোর্ট অ্যান্ড মেক এ বিগ স্ক্যান্ডাল আউট অফ ইট? মোহনের উকিল হিসেবে আমার বিরুদ্ধে মামলা লড়বি?

নন্দিতা বাবার চোখে চোখে চেয়ে মাথা নাড়ল, তাই।

প্রতাপ বোস এবারে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, নানু-মা, এত লেখাপড়া শিখেও শেষে সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি? মোহনের হয়ে যে মামলা করবি, ও তোকে ওর ওকালতনামাটা দিয়েছে তো? আইন পড়ে শেষে নিজেই আইন ভুলে গেলি? ওকালতনামা না পেলে ওর ল ইয়ার হিসেবে কোর্টে যাবি কি করে?

এই খোঁচা শুনে নন্দিতার দুকান গরম হয়ে উঠল। বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার বাবা, মোহনের কাছ থেকে সেটা পেতে আমার দু মিনিটও লাগবে না।

প্রতাপ বোস হাসছে, ঠিক আছে, ওটাই নিয়ে আয় আগে।

সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করল নন্দিতা। ওর কপালে শেষে এ-ও ছিল? কিন্তু ও-ও ওই বাবারই মেয়ে! ধরেছে যখন করবেই। বাবার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ওকে করতেই হবে। কিন্তু শুধুই কি তাই? নন্দিতা কি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে বাবার অন্যায়ের প্রতিকার করা ছাড়া ওর মনের গভীরে আর কোনো কিছুই নেই? কি-চ্ছু নেই?

নিজের কাছে জবাবদিহির দায় বালিশে মুখ গুঁজে জোর করে ঘুমুতে চেষ্টা করল।

পরের দিনই দুপুরবেলা নন্দিতা 'হোলি-গার্ডেন'-এ গেল। মোহন ঘরেই ছিল। নন্দিতা তাড়া লাগাল, দু'মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

মোহনের নড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মুখে মেকি ভয়. কি ব্যাপার? ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করবে নাকি?

নন্দিতার আজ কোনোরকম হালকা কথাবার্তার মেজাজ নয়। বলল, কি ব্যাপার তুমি জান না? হারানকাকা তোমাকে কিছু বলেনি?

হাল ছেড়ে দিয়ে মোহন গাড়িতে উঠল।

গঙ্গার ধারে গাড়ি রাখল নন্দিতা। তারপর নেমে সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসল। মুখোমুখি মোহনও বলল, কাকুর হুকুম তোমার সব কথা শুনতে হবে, বল শুনি।

নন্দিতা মোহনের চোখে চোখ রেখে খুব স্পষ্ট গলায় বলল, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই—নিতে হবে।

মোহন ছদ্ম-ভয়ে বলে উঠল, আবার! বাঁ চোখের নিচে কালো দাগটায় আঙুল রাখল, এই যে দিয়েছ এই যথেষ্ট, এরকম আরও দিতে চাইলে এবার সত্যিই মারা পড়ব। হাসতে লাগল।

নন্দিতার চাউনি বিষণ্ণ হয়ে উঠল। চাঁদের কলঙ্কের মতই সেদিনের সেই মারের দাগ ফর্সা মুখে এখনো কালো হয়ে ফুটে আছে। নন্দিতাকে শিক্ষা আর লজ্জা দেবার জন্যেই যেন কোনো-দিনই আর মেলাবে না। ধরা গলায় নন্দিতা বলল, এর জন্যে আমি যে কতকষ্ট পেয়েছি বুঝতে পার না? এ কথা বলার চেয়ে তুমি বরং আমায় মার—

মোহন হাসছে, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, এটার জন্যেই তো তোমাকে এভাবে পেলাম!

নন্দিতার বুকের মধ্যে আবেগের ঢেউ। মোহনের একটা হাত নিজের দু-হাতে আঁকড়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, কিন্তু আমার যে এখনো অনেক চাওয়া বাকি, অনেক পাওয়া বাকি। থামল একটু, জোর করে নিজেকে সংযত করল। তারপর বলল, আপাতত শুধু একটা জিনিসই চাইব, তুমি আমাকে তোমার ওকালতনামা দেবে।

মোহন হাসছে, তারপর? সেই জোরে নিজের বাবার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবে?

নন্দিতা মাথা নাড়ল।—না, তুমি আমাকে ওকালতনামাটা দিলেই তার আর দরকার হবে মনে হয় না। বাবা নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখার জন্যেই এতবড় স্ক্যান্ডাল চাইবে না, এমনিই সব ফিরিয়ে দেবে। ইন ফ্যাক্ট, তোমার কাছ থেকে ওকালতনামা আদায় করা নিয়েই বাবা আমাকে আসল চ্যালেঞ্জটা করেছে। আমি তাকে বলে এসেছি সেটা পেতে আমার দু মিনিটও লাগবে না।

মোহন হেসে উঠল।—কাকাবাবু ঠিক জায়গা বুঝেই চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়েছেন, তুমিই ভুল করেছ।

নন্দিতা নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারল না।—তার মানে? তুমি আমাকে তোমার ওকালতনামা দেবে না? বলছি তো শুধু এটুকু পেলেই বাবা সব ছেড়ে দেবে, কোর্টে আমাকে যেতে হবে না।

মোহনের ঠোঁটে মজা পাওয়ার হাসি, আর তারপর? একসঙ্গে রাজত্ব আর রাজকন্যা? তাও আবার শুধু একটা রাজত্ব নয়, একেবারে ডবল রাজত্ব, কারণ তোমার বাবার সবই তো তোমারই।

শ্লেষ বুঝে নন্দিতার থমথমে মুখ। বলল, রাজত্বের কথা ছাড়। রাজকন্যার কথা যখন তুললেই, তখন সে ফয়সালাই আগে

খোলাখুলি হোক। সোজা চোখে চোখ রাখল। তুমি আমাকে ভালবাস না ?

মোহনের মুখ থেকে চপলতা মুছে যেতে লাগল। চোখে দূরের ছায়া। বুকের গভীর থেকে কথাগুলো উঠে এলো।—কত যে ভালবাসি তা তুমি জানো না। কিন্তু এই ভালবাসার স্বাদ আলাদা, রীতি আলাদা, এ তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

আশায়-আকাঙ্ক্ষায় নন্দিতার নিঃশ্বাসও থেমে রইল যেন। হাত থেকে মোহনের হাত খসে পড়ল। মোহন বলে চলেছে, কোন ছোটবেলায় নিজের বাপ-মা হারিয়েছি, সে অভাব অনেকটা মিটেছে হারানকাকু আর তোমার মাকে পেয়ে। বাবা গেল, কিন্তু ছেলের জন্যে রেখে গেল বিষয়ের বিষ। সেই বিষে তোমাদের সংসার ছারখার, আর আজ সেই বিষেরই ভাণ্ডার নিয়ে নিজের বাবার সঙ্গে এতবড় অশান্তি করে তুমি আমার কাছে আসতে চাইছ, এর থেকে কি কখনো অমৃত উঠতে পারে ?

নন্দিতা তাকিয়ে আছে। সব হারানোর ব্যথা ছাপিয়ে শুধু বারবার একটা প্রশ্নই বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কি পেলে মানুষ এই বয়সে এতখানি নির্লোভ হতে পারে, এত নিরাসক্ত হতে পারে! সত্যিই কি এমন সম্পদ আছে কোথাও ? বুক ঠেলে কান্না উঠে আছে নন্দিতার। অস্ফুটে বলল, কিন্তু তোমাকে ছাড়া শুধু তোমার দয়ার দান নিয়ে আমি থাকব কি করে!

মোহন হাসল, আশ্চর্য সুন্দর অথচ আরও দূরের সেই হাসি। বলল, দয়ার দান ভাবছ কেন ? ভাব না, তোমার কাছে সব শুধু গচ্ছিত রইল। যা করলে সব থেকে ভাল হয় ও নিয়ে তাই কোর।

দুচোখ ভরা জল নিয়ে নন্দিতা মাথা নাড়ল, আমি কিচ্ছু করতে পারব না।

মোহন হাসছে, পারবে। বিষের থেকে অমৃত তোলাই সবচেয়ে কঠিন। আমি পারিনি। সেই কাজ তোমার জন্যে রইল। থামল

একটু। এর পরের কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো। —মাকে নিয়ে, হারান কাকুকে নিয়ে, মিহিরকে নিয়ে—সকলকে নিয়ে গড়ে উঠবে তোমার সুন্দর জগৎ। আস্তে আস্তে সেখানে একটি দুটি শিশুর হাসি ঝরবে। আমিও কখনো সেই আনন্দের ভাগ নিতে যাব। হাত তুলে মাথার ওপরের নীল আকাশ, সামনের দিগন্ত-ছোঁয়া গঙ্গা আর চারপাশের বিস্তৃত সবুজ দেখিয়ে আরও শান্ত গলায় বলল, কিন্তু এই বিশাল বিশ্বের এতবড় আশ্রয় থেকে আমাকে কেড়ে নিতে চেও না।

উঠল। আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। নন্দিতা দেখছে। বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। চোখের জলে চারদিক ঝাপসা। এক অস্পষ্ট কুহেলির মধ্যে দিয়ে মোহন চলে যাচ্ছে। মানুষ যত দূরে যায়, তত ছোট দেখায়। কিন্তু নন্দিতা চোখের জলে ভেসে অবাক হয়ে দেখছে মোহন যত দূরে সরছে তত বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে চারদিক জুড়ে বিরাট হয়ে উঠেছে।